নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

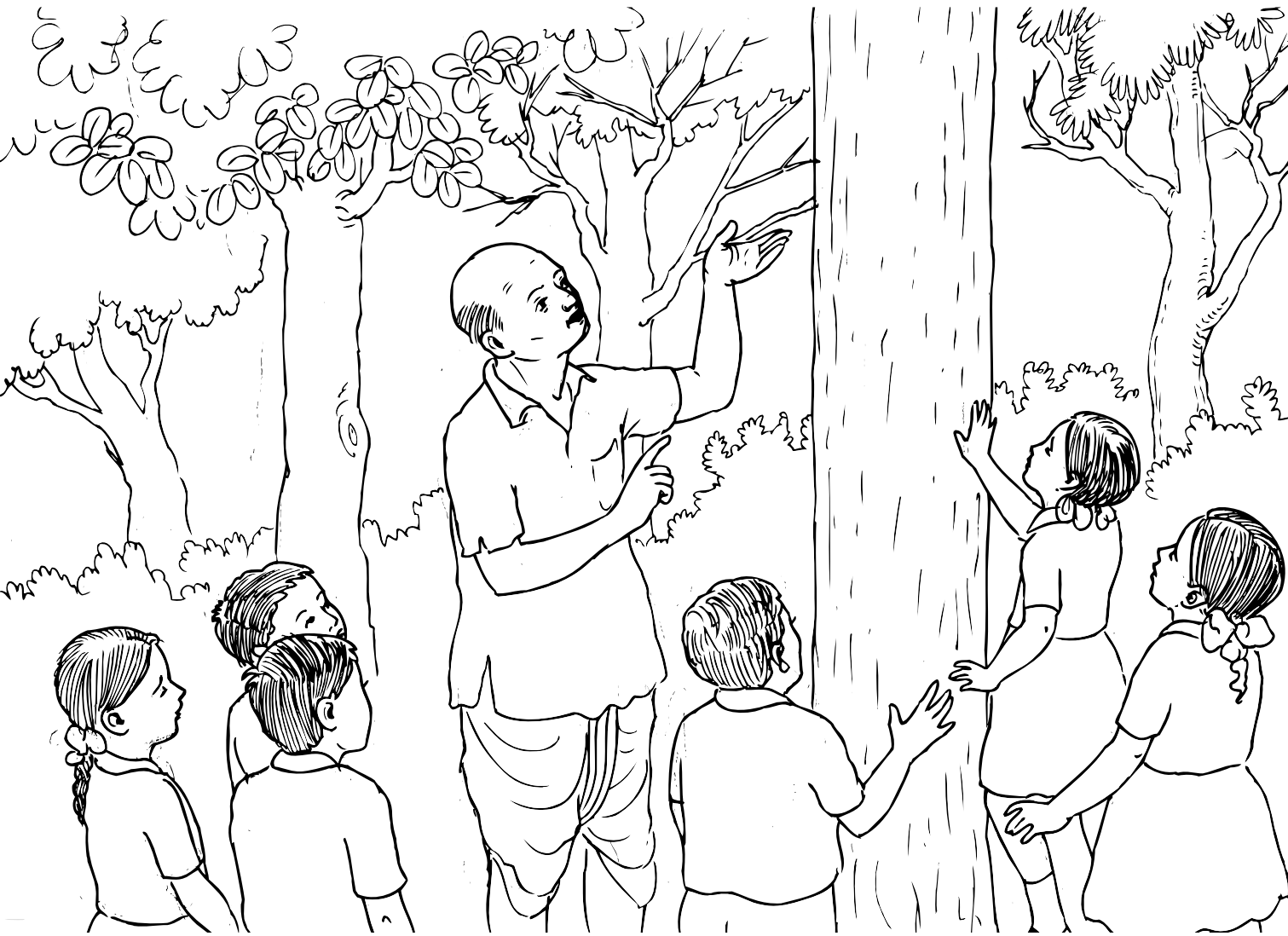

সংকলন ১০। ■ এপ্রিল ২০১৬

[redacted]

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন - ১০ । এপ্রিল ২০১৬

সম্পাদকীয়

আফটার স্কুল

পঠন-পাঠনের একটি ক্ষেত্র হল বিষয়গত পড়াশোনা যা সাধারণত চার দেওয়ালের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম ধরে হয়। তাকে আমরা বলি ক্লাসের পড়া।আরেকটি ক্ষেত্র হল জীবনের পড়াশোনা। এই জীবনের পড়াশোনাটা হয় হাতে কলমে কাজ করতে করতে।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে বিকেলবেলা স্কুল বাড়িগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে শুধু হাওয়া ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে একদিন আমরা দেখলাম বিকেলের আলোয় সেখানে ঢুকছে একদল যুবক/যুবতী যারা স্কুলের গতানুগতিক রুটিন-এর বাইরে হাতে কলমে শিখতে চলেছে পশুপাখীদের জন্য পুষ্টিকর খাবার অ্যাজলা, কেঁচো সার, কাটিং-গ্রাফটিং আরও কত কি। এই সব শেখার ভিতর দিয়ে গ্রামের যুবক যুবতীরা শিখবে নতুন নতুন কৌশল, যা তাদের গ্রামে থেকেই দক্ষতা বৃদ্ধি করে আয়ের পথে পা বাড়াতে সাহায্য করবে।

আজ গ্রামে গ্রামে এতো ছেলে মেয়ে মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। তাদের জন্য কি গ্রামের স্থানীয় সরকার ভাববে না? ভাববে...যদি তা পায় একটু সহায়তা। এইসব ক্লাসগুলো কিন্তু মাস্টার মশাইরা নেবেন না। স্থানীয় অভিজ্ঞ কোন চাষি, ব্লকের কোন আধিকারিক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

এখন প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে দু তিনটে স্কুলেও আফটার স্কুল নামে যদি এই হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির আয়োজন করা হয় তাহলে দিগন্ত খুলে যাবে। দেখা যাবে হয়তো কনও স্কুলছুট যুবতী তার বাবাকে বলে বসেছে, বাবা আমি আফটার স্কুলে যাব... সেদিন ঘটবে আসল জাগরণ।

সূচীপত্র

১। স্মৃতির পাতা থেকে... ১

২। নতুন দিশায় নতুন উদ্যোগ ... ২

৩। আজন্মকাল ২

৪। শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও আজ ... ৩

৫। কবিকে নতুন করে চেনা ৫

৬। বিদ্যালয়ে আধ্যাত্মিকতা ... ৬

৭। আদর্শ শিক্ষকের গল্প ... ৮

৮। তথ্য যখন সত্যের মুখ ১৩

৯। সিয়াটেল ভাষণ ... ১৭

১০। *বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা* ঃ ম্যালকম আদিসেশিইয়া ১৯

১১। *এসো তাঁদের গল্প শোনাই* ঃ লালন ২১

১২। *সেই সময়* ঃ সুন্দরবন ২৪

১৩। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান এবং পরিবেশ ভাবনার .. ২৬

১৪। নতুন ধারার "বিজ্ঞান"শিক্ষা ভাবনা .. ২৭

১৫। বিদ্যালয় শিক্ষার্থী মননে জৈববৈচিত্র" সংরক্ষণ ২৮

১৬। মাঠের শেষে নতুন দিগন্ত ২৯

১৭। সর্পমঙ্গলঃ সাপ নিয়ে একটি অনবদ্য তথ্যচিত্র ২৯

১৮। বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে .. ৩০

গ্রাম পঞ্চায়েত এই রকম নানা ধরণের জিনিষ শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে তারা তাদের কার্যালয়ে এবং কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী স্থানে কিন্তু স্থানাভাব ও অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার সাথে দূরবর্তিতার কারণে তারা সকল উৎসাহিত মানুষজনকে এই উদ্যোগগুলিতে যুক্ত করতে অসমর্থ হচ্ছে। তাই বর্তমানে এইসব অসুবিধাগুলিকে দূর করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের অঞ্চলের সকল উৎসাহিত মানুষজনকে তাদের অঞ্চলের স্থানীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পর ধাপে ধাপে এই ধরণের বিভিন্ন জিনিষ শেখার সুযোগ দেবার প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

স্মৃতির পাতা থেকে...

কোচবিহার জেলার ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খারিজা বালাডাঙ্গা গ্রামের এক বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যম সন্তান স্মৃতি বর্মণ। বাবা কমলাকান্তকে বছরের প্রায় ৬ মাস-ই কাটাতে হয় গ্রামের বাইরে কীর্তনপালা করে সংসার চালানোর জন্য। মা সরস্বতী বর্মণ তার দুই মেয়ে আর এক ছেলেকে নিয়ে কোনোরকমে টেনেটুনে নিয়ে যাচ্ছিল সংসার।

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন ঠিক হয়ে গেল স্মৃতির দিদির বিয়ে। অভাবের সংসারের শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে কমলাকান্ত আর সরস্বতী তাদের বড় মেয়ের বিয়ে দিল। পাশাপাশি স্মৃতিও ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। তারপর একদিন ষোড়শী স্মৃতি দিতে বসল মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু কপালের ফেরে সে অকৃতকার্য হল। ভেঙ্গে পড়ল স্মৃতির মন। দিন আনা দিন খাওয়া কমলাকান্ত আর সরস্বতী স্মৃতির জন্য শুরু করল সুপাত্রের খোঁজ। অষ্টাদশী স্মৃতির বিয়ে হয়ে গেল দূরবর্তী এক গ্রামে। বাবা-মা-ভাইকে চোখের জলে বিদায় দিয়ে স্মৃতি গিয়ে উঠল তার শ্বশুরবাড়িতে। শুরু হল স্মৃতির জীবনের নতুন এক অধ্যায়। কিন্ত এখানেও বিধাতার কঠিন পরিহাস। মাত্র ১ মাসের ভিতরেই সে ফিরে আসতে বাধ্য হল তার বাপের ভিটায়। এই বেদনা সহ্য করতে না পেরে কমলাকান্ত সারাদিন বিভোর হয়ে থাকত নানা চিন্তায়। পরিবারে শুরু হল নানা অশান্তি। দিনের বেলা সেই যে বার হত কমলাকান্ত রাতের বেলা গ্রামের নানা জায়গা থেকে সাধ্য-সাধনা করে পরিবারের লোকেরা তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনত। সংসার চালানোই ধীরে ধীরে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল সরস্বতীর। এক মেয়ে, এক ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছিল সে।

এমত অবস্থায় একদিন সরস্বতী খবর পেল ভেটাগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের পাড়ায় সকলকে নিয়ে এক আলোচনার আয়োজন করেছে। নির্দিষ্ট দিনে সরস্বতী, মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হল সেই আলোচনায়। সেখানে সে জানতে পারল মাধ্যমিক পাশ করতে পারেনি এমন ১৪ বছর থেকে শুরু করে ৩০ – ৩২ বছর অবধি পুরুষ - মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের কাজ শিখিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এইসব বিভিন্ন উদ্যোগের ভিতর সরস্বতী ও স্মৃতির সবছেয়ে ভালো লাগল শোলা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার উদ্যোগটি। আশা-নিরাশায় দুলতে থাকা স্মৃতি তখনই তার নাম দিল শোলার কাজ শেখার জন্য। মন ভেঙ্গে গেল সরস্বতীর। বয়স বেশী হবার কারণে সে অংশগ্রহণ করতে পারল না এই উদ্যোগে। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্রী ছিল না সরস্বতী। লেগে থাকল পঞ্চায়েতের পিছনে। অনেক অনুরোধ, কাকুতি-মিনতির পর পঞ্চায়েত তার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে এক ব্যতিক্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিল সরস্বতীকে শোলার কাজ শেখার জন্য।

মা ও মেয়ের শুরু হল এক নতুন লড়াই। কাকভোরে উঠে সংসারের সব কাজ শেষ করে দুজনে মিলে চলে আসে গ্রাম পঞ্চায়েতে। সারাদিন তাদের মত আরও ২৮ – ৩০ জন মেয়ে, বৌ-দের সাথে মেতে ওঠে শোলা দিয়ে নানান জিনিস শেখার কাজে। ধীরে ধীরে তারা খুঁজে পেতে থাকে এক নতুন জীবনে পথের রেখা। মেয়ের মুখের হাসি দেখে মায়েরও বুক ভরে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। আস্তে আস্তে তারা শোলা দিয়ে তৈরি করতে শেখে মালা, ময়ূর, কদম ফুল এবং আরও নানা জিনিস। শিখতে শিখতেই তারা বিক্রি করতে থাকে উৎপাদিত পণ্য। মা ও মেয়ের এই কর্মকান্ড প্রভাবিত করে কমলাকান্তকেও। ঘরের পয়সা খরচ করে কমলাকান্ত শোলার মাষ্টারমশাই লক্ষণদাকে দিয়ে তৈরি করে নেয় শোলা কাটার ছুরি ও শান দেবার পাথর। ঘরে বসেই কমলাকান্ত, সরস্বতী ও স্মৃতির কাছ থেকে শিখতে থাকে শোলার জিনিস তৈরি করা। এই খবর যায় লক্ষণদার কাছেও – নাড়া দেয় তার অন্তরকেও। ফাঁক পেলে মাঝে মাঝে লক্ষণদা বাড়িতে এসে একটু-আধটু দেখিয়ে দিয়ে যায় কমলাকান্তকেও। ধীরে ধীরে স্মৃতি ও সরস্বতীর সাথে সাথে পণ্য উৎপাদন করতে থাকে কমলাকান্ত আর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার দায়িত্ব নেয় লক্ষণদা। কিছু পয়সাও আসতে শুরু করে ঘরে। কাঁচামাল শেষ হয়ে গেলে কমলাকান্তই এখন সাইকেলে করে গিয়ে কিনে নিয়ে আসে কাঁচামাল।

সরস্বতী এখন বলে " আগে যাকে বাইরে থেকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হত, এখন তাকে গভীর রাত অবধি অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয় শোলা কাটা ছেড়ে

খাওয়া-দাওয়া করে শোবার জন্য – পঞ্চায়েতকে প্রণাম এমন সুযোগ দেবার জন্য।"

কমলাকান্ত, সরস্বতী আর স্মৃতি কাজ শিখতে শিখতে এই ৫ – ৬ মাসেই প্রায় আয় করেছে ৯০০০/- টাকার কাছাকাছি। তারা এখন বাজারের যা চাহিদা সেই তুলনায় মাল যোগান দিয়ে উঠতে পারছে না। এইজন্য তারা তাদের মত আরো ৪ – ৫ জনকে শিখিয়ে তাদের সহযোগিতায় আরো উৎপাদন করছে বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য।

বুকভরা একরাশ আনন্দ আর মুখে এক মৃদু হাসি নিয়ে স্মৃতি, সরস্বতী, কমলাকান্ত - সবার এখন আশা নিজেদের অঞ্চলের বাইরেও বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানের বাজারেও তাদের তৈরি উৎপাদিত পণ্য স্থান করে নেবে।

নতুন দিশায় নতুন উদ্যোগ

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হাতির উপদ্রব নতুন নয়, নতুন নয় হাতির তাণ্ডবে বিঘার পর বিঘা ফসল নষ্টের ঘটনাও। এখন নতুন ঘটনা হল, এই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে মাঠে এমন কিছু করা যা হাতিতে নষ্ট করে না।

আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। আর এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং পশ্চিম সাতালি সংসদের এক দরিদ্র পরিবারের ছেলে সিন্টু ওরাও। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সেই সবার ছোট, রয়েছে দুই বোনও। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মূলত আর্থিক অনটনের কারণেই অষ্টম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা চালাতে পারেনি সিন্টু। সংসারের অভাব ঘোচাতে সেও এখন নেমে পড়েছে রোজগারের চেষ্টায়। অল্প কিছু জমি থাকলেও শুধুমাত্র হাতির ভয়ে সেখানে চাষ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল সিন্টুর পরিবার। তবে মন থেকে কখনই মেনে নিতে পারত না সিন্টু। ওই জমিতে নতুন কিছু করার চিন্তা ঘুরপাক খেত তার মনে।ভাবত বিকল্প কিছু করার কথা। এ অবস্থায় আচমকাই নতুন এক দিশার সন্ধান পায় সিন্টু। মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত পাড়ার একটি আলোচনায় গিয়ে সে জানতে পারে হাতে কলমে বিভিন্ন গাছের কলম করা শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ কথার জানার পর আর চুপ করে বসে থাকেনি সে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়িতে বসেই হাতে কলমে এই কাজ শিখে নেয় সিন্টু। এক বছরের মধ্যে সে নিজে ৪৫টি বিভিন্ন প্রজাতির লেবুর কলম করে আস্ত একটা বাগান গড়ে তোলে।

ধান বা সবজির মতো ফি বছর হাতির হানায় ফসল নষ্ট হওয়া নিয়ে সিন্টুকে এখন আর আতঙ্কে থাকতে হয় না। এছাড়া গরু, ছাগল ফল গাছের তেমন ক্ষতিও করে না, তাই আলাদা করে বাগান দেখভালের প্রয়োজন পড়ছে না। ওই সময়টায় আগের মতই সে হাজিরার কাজ করে কিছু বাড়তি আয়ও করতে পারছে।

সিন্টু আজ বুঝতে পেরেছে, বাজার থেকে চারা কিনে এনে তার পক্ষে এমন বাগান করা সম্ভব ছিল না। আর অসম্ভবটা সম্ভব হয়েছে মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের সদ্ব্যবহার করে কলম থেকে হাতে কলমে চারা তৈরি শিখতে পারায়। আগামী দিনে এভাবেই আরও কিছু লেবু বাগান গড়ে তুলতে চায় সিন্টু।

আজন্মকাল

শিক্ষাই আমার মুক্তি
নতুন কিছু শেখা, নতুন জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি, চেতনার বিকাশ
শিক্ষাই মুক্তি
শিক্ষা মানে পরিবার, শিক্ষা মানে বন্ধু
পাখি, গাছপালা, চারপাশের নানা অজানাকে জানা
শিক্ষাই মুক্তি
প্রিয় শিক্ষক, আনন্দময় করে তুলুন শিক্ষাকে
সম্পৃক্ত করুন আমার সঙ্গে
আমায় আমার মতো করে শিখতে সাহায্য করুন
বাড়ান আমার দক্ষতাকে
শেখান জীবনের সঠিক অর্থ
আনন্দ যোগান পড়তে
উৎসাহ দিন নতুনের খোঁজে
যেন সর্বদা মুখিয়ে থাকি নতুন জ্ঞান আহরণে
আর এতে যদি মেলে ভাল একটা চাকরি, তা আরও সুখের
তবে সবার আগে আমায় মুক্ত করুন, মুক্ত করুন চেতনাকে

সরোজিনী ভিত্তাচি

শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও আজ স্কুলমুখী

সুজিত সিনহা

অধ্যাপক সুজিত সিনহা বিগত তিন দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিরলস ভাবে কাজ করেছেন এবং তিনি বর্তমানে আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসাবে সংযুক্ত। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমঃ sujit.sinha@apu.edu.in

গ্রামের অধিকাংশ গরিব পরিবারেই গড়ে ৫-১৫ টি করে দেশি মুরগি থাকে। বাচ্চারাও একথা জানে যে, বাড়িতে যখন কোনও আত্মীয়-পরিজন আসবেন তখন ওই মুরগি কেটেই মাংস রান্না করতে হবে। শুধু তাই নয়, হঠাৎ করে যখন টাকার প্রয়োজন হয় তখনও কোঁপ পড়ে ওইসব মুরগিগুলোর উপরই। এছাড়া বছরে দু'বার বা তিনবার মহামারীর প্রকোপে অনেক মুরগির মৃত্যুও হয়। গ্রামের মানুষ জানেন, তাদের এলাকায় সরকারি, বেসরকারি একাধিক পশু চিকিৎসক রয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কে ওই ১৫টি মুরগির চিকিৎসা করতে আসবেন। কারণ এজন্য পশু চিকিৎসকেরা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে থাকেন। তাই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বাচ্চাদের বলা হয়েছিল, "তোমরা নিজেরা কেন ওইসব মুরগিদের টিকা দাও না?" এই প্রশ্ন শুনে তারা বেশ অবাক হয়েছিল– "আমরা তো অনেক ছোট, কীভাবে এটা করবো?" এরপর একটি বাচ্চার প্রশ্ন ছিল, কেন পারবো না ? শুরুটা ছিল এটাই! আটটি গ্রামের প্রায় ২০০ জন কিশোর-কিশোরী মুরগিদের কীভাবে টিকা দিতে হয় তা শিখে ফেলে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে বলেন– "দয়া করে সকালে আপনাদের মুরগিগুলো বাইরে ছাড়বেন না, আমরা ওদের টিকা দিতে আসবো।" গ্রামবাসীরা আশ্চর্য হয়ে দেখেন, সকাল সকাল তাদের বাড়ির দরজায় ৫-৬ জন বাচ্চার দল এসে হাজির। তারা একের পর এক মুরগিগুলোকে ধরছে আর ভ্যাকসিন দিচ্ছে। প্রথম বছর এই টিকাকরণ হয়েছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, পরের বছর থেকে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তারা শুধু ওষুধটুকুর দাম নিতে শুরু করে। এরফলে মুরগির মৃত্যুর হার অনেকটাই কমে যায়। শুধু তাই নয়, তৃতীয় বছর থেকে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে টিকার ওষুধের দামের পাশাপাশি এই পরিসেবা দেওয়ার জন্য ওই কিশোরদের কিছু পারিশ্রমিকও দিতে শুরু করেন। এতে গরিব স্কুল পড়ুয়াদেরও কিছু আয় হতে থাকে।

উপরের অংশটি পড়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে কিছু প্রশ্ন উঠবে। যে প্রশ্নগুলো হল, এই মুরগিগুলো কোন প্রজাতির? ব্রয়লারের থেকে কেন তারা আলাদা? তাদের কী ধরণের রোগ হয়? কীভাবে ওই অসুখ ছড়ায়? টিকাকরণের কাজটা কীভাবে হয়? কে এইটা আবিষ্কার করেন? গরু, ছাগলের কোন কোন অসুখ আমাদের বেশি ক্ষতি করে? আমরা কি ওইসব অসুখ ধরতে বা তার চিকিৎসা করতে পারি? এইসব কথা কি তোমার স্কুলের বইয়ে লেখা রয়েছে? দুর্ভাগ্যের– স্কুলের পাঠ্য বইটা অস্ট্রেলিয়ান গরুর কথা বলে! সরকারি পশু চিকিৎসক কি স্কুলে ক্লাস নিতে পারে না? অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সাথে এমনই অনেক প্রশ্ন নিয়ে শিশুরা দেখা করেছিল ব্লকের ভেটেরিনারি অফিসারের সঙ্গে। শিশুরা তার কাছে থেকে জানতে পারে গরু, ছাগলের অসুখ-বিসুখ কীভাবে ধরতে হয়। এবং এরপরই ওই শিশুরা গরু, ছাগলের জন্য একটি টিকাকরণ কর্মসূচি পালন করতে চায়। এতে নিজের বকেয়া কাজ অনেকটাই হয়ে যাবে এই ভেবে শিশুদের প্রস্তাবে ওই ভেটেরিনারি অফিসারও বেশ উৎসাহিত হন। শিশুরা এরপর নিজেদের মধ্যে বসে একটি পারিবারিক সমীক্ষাপত্রের খসড়া তৈরি করে।

যেখানে প্রশ্ন ছিল, কতগুলো গরু আর ছাগল রয়েছে? তাদের বয়স কত? তারা কোন প্রজাতির? আপনার কি নিজের জমি রয়েছে? ওইসব পশুদের খাবারের উৎস কী বা তা পেতে কী অসুবিধা হয়? তাদের কী ধরণের অসুখ হয়? ইত্যাদি। এরপর তারা নেমে পড়ে তথ্য সংগ্রহে। পরে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে তারা আবার বসে টেবিল, বার ডায়াগ্রাম, পাই চার্ট তৈরি করে, নিজেদের অজান্তেই তাদের কাছে অঙ্ক হয়ে ওঠে খুবই আনন্দের ও কাজের! এখন তারা জেনে গেছে, কতগুলো বাড়িতে একটি করে গরু রয়েছে, কতগুলোয় ২-৫টি, কতগুলোয় ৫-১০টি এবং কার গরু রয়েছে কিন্তু জমি নেই, দুগ্ধ উৎপাদন, কত টাকায় গবাদি পশু বিক্রি হয়েছে ইত্যাদি। তখনও একদল শিশুর অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি ছিল! এরপর তারা প্রচার চালিয়ে গরু, ছাগলের টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে তাকে সার্থক রূপ দিতে স্কুল, গ্রামবাসী, পঞ্চায়েত সদস্য, ব্লক আধিকারিক, সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন। এক কথায় এটা ছিল অনবদ্য শিক্ষার এক আনন্দ-মেলা।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে স্কুল-শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? আমরা সবাই জানি যে, বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশুদের জন্য খুব সুন্দর একটি শিক্ষানীতি ও তার আসল উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য মহৎ প্রচেষ্টা। এতকিছু সত্ত্বেও স্কুল-শিক্ষা হল কোনও

একটি জায়গায় দিনের পর দিন ৪-৫ ঘণ্টা ধরে ঘরের মধ্যে বসে পাঠ্যবই পড়া ও বোঝার চেষ্টা করা। আশা করা যায়, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও সহায়তা থাকে। এরপর ঘরে ফিরে সেই পাঠ বার বার মনে করা আর পরীক্ষায় সেটাই 'বমি' করা।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীনিকেতন' বই থেকে জানা যায়ঃ ১৯২৪ সালের ১ জুলাই শান্তিনিকেতনের কাছে তৈরি হয় শিক্ষাসত্র। যেখানে প্রতিটি ছেলেকে এক খণ্ড করে জমি দেওয়া হয়, যা খেলার মাঠ ও পরীক্ষামূলকভাবে খামার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো। নিজের পছন্দ ও দক্ষতা অনুযায়ী ওই ছেলেটির সেখানে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল। দিনের মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ ছিল ৩ টাকা আয়ের জন্য। তাদের শেখা প্রতিটি হাতের কাজ এক একটা 'প্রজেক্ট' হিসাবে দেখা হতো, যা ছিল এক ভিন্ন ধরনের প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা। ১৯২৮ সালের রিপোর্টে খুব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, এইসব হাতের কাজের একটি নির্দিষ্ট আর্থিক মূল্য থাকতে হবে। এবং উৎপাদিত জিনিস ঘরে ব্যবহারের যোগ্য হবে এবং যা বাইরেও বিক্রি করা যাবে। শিক্ষাসত্র অনেকাংশেই গান্ধীর প্রাথমিক শিক্ষা ভাবনাকেই তুলে ধরেছিল।

১৯৩৭ সালে সেবাগ্রামে মীরা বহেন ও অন্যদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে আনন্দ নিকেতন। পরে অনেক বছর ধরে তা আরণ্যকমদের (একসময় যারা শিক্ষাসত্রে কাজ করেছিলেন এবং কিছু সময় আগে তারা শান্তিনিকেতন থেকে ওয়ারধায় গিয়েছিলেন) নেতৃত্বে চলে এবং মারজোরি সাইকস্ তাঁর বইয়ে সুন্দরভাবে এসবের বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৬০ সালে স্তব্ধ হয়ে যায় নঈ তালিমের ভাবনা, ঠিক যেমন বন্ধ হয়ে যায় এদেশের একই ধরনের অন্যান্য প্রারম্ভিক বা বুনিয়াদী বা নঈ তালিম স্কুলগুলি। কিন্তু তালিমি সঙ্ঘের সাহায্যে সুষমা শর্মার সাহসী পদক্ষেপে ২০০৫ সালে আবার যাত্রা শুরু করে আনন্দ নিকেতন।

আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির এম. এ. এডুকেশন প্রোগ্রাম ২০১১-২০১৩-র ছাত্র অঙ্কিত, বর্তমানে যে ওই স্কুলের সঙ্গে কাজ করছে, তার কথায়, "এখানকার প্রতিটি শিশুরই একখণ্ড কৃষিজমি রয়েছে, যেখানে তারা গাছ লাগায়, তা দেখভাল করে এবং তাতে জল দেয়, তারা গণনা করতে শিখছে, শিখছে মাপজোক, পরিমাপ সংক্রান্ত বিদ্যা, বিভিন্ন আকৃতি, কোণ, তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়া করা, ভগ্নাংশ, দশমিক, আনুপাতিক ভাগ এবং এন. সি. ই. আর. টি.-র পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর অঙ্কের বইয়ে থাকা যাবতীয় বিষয়। এবং তারা এখানে খুবই আনন্দ করে, শুধু তাই নয় সপ্তম শ্রেণির পর যারা অন্যত্র চলে গেছে তাদেরও একটাই আক্ষেপ, এখনও যদি এখানে থাকতে পারতাম।

"দুর্ভাগ্যবশত, আনন্দ নিকেতনের সরকারি অনুমোদন নেই, ঠিক যেমন মহারাষ্ট্র সরকার নতুন কোনও মারাঠি স্কুলকে স্বীকৃতি দেয় না আর আনন্দ নিকেতনতো মাত্র সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত! আসলে সে সময় মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের একটা মূল্যবান অস্তিত্ব ছিল, যার মূল কথা ছিল "কাজ আর শিক্ষার" মধ্যে দিয়ে কিছু শিশু আনন্দ করছে।

দাঁড়ান– শুধু কি শিশুরাই সেখানে মজা করতে যাচ্ছে? তাদের অভিভাবকরা? পশ্চিমবঙ্গে 'স্বনির্ভর' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে, যারা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি স্কুল চালায়। ২০০২ সালের মে-জুন মাসে তারা অভিভাবকদের জন্য ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। একই গ্রাম থেকে আসা অভিভাবকরা (মূলত মায়েরা) সবাই সেখানে একসঙ্গে বসেছিলেন এবং তাদেরকে নিজের গ্রামেরই মানচিত্র আঁকতে বলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে স্বনির্ভরের শিক্ষকেরা একটা বল ঘোরাতে ঘোরাতে সকলকে বলেন, প্রথমে তারা তাদের বাড়ি থেকে স্কুলের রাস্তাটা আঁকুন। অল্প সময়ের মধ্যেই উপস্থিত সব অভিভাবকরাই গোটা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের ছবিতে সব রাস্তা, বড় গাছ, সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত টিউব ওয়েল, চাবির দোকান, স্কুল, ধর্মীয় স্থান, এমনকি বসত বাড়ি, বিশেষ করে নিজেদের বাড়িটা আঁকতে শুরু করেন!

অভিভাবকদের জন্য দ্বিতীয় অনুশীলনী ছিল, সময় সরণি তৈরি করা। বিষয়টি বোঝানোর জন্য স্বনির্ভরের শিক্ষকেরা প্রথমে একজনকে সাহায্য করেন, কীভাবে সময় সরণির মাধ্যমে নিজের জীবনকে ব্যক্ত করতে হয় এবং এরপর অসংখ্য সময় সরণি তৈরি করার জন্য অভিভাবকরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যান।

এই ঘটনার ঠিক পরদিন, যারা সেই কর্মশালায় ছিলেন না বা আসতে পারেননি এমন অনেক মায়েরা স্বনির্ভরের শিক্ষকদের কাছে জানতে চান, কেন তারা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলেন! অনেক বছর ধরে সাক্ষর ও নিরক্ষর অভিভাবকদের (বাবারাও যোগ দিচ্ছেন)এধরণের কর্মশালায় যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। তাই পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না থাকা সত্বেও স্বনির্ভর শিশুদের মধ্যে যে কাজ করছে তাকে এই অভিভাবকরা আজ প্রশংসার চোখেই দেখেন! অভিভাবকরা এখন নিজেরাই আমাদের জন্য (বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়তি জিনিস বানাচ্ছেন!) বিভিন্ন শিখন সামগ্রী তৈরি করছেন এবং তা সমৃদ্ধ করে চলেছেন; এছাড়া সেখানে অনেক প্রবীণরাও রয়েছেন, যারা 'নতুন' মায়েদের সুপরামর্শ দিয়ে চলেছেন। অভিভাবকরা এখন তাই মুখিয়ে থাকেন, কবে আবার এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে? যদিও এখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অভিভাবকদের জন্য আলাদা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিশুর অভিভাবকদের জন্য আলাদা দিনে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সব 'বিকল্প' স্কুলই কিছু নতুনত্ব, কিছু অভিনব করার চেষ্টা করে বা তা প্রয়োগের চেষ্টা করে থাকে। যেমন শৌচাগার সমীক্ষা, জলের সমীক্ষা, গাছের বিষয়ে সমীক্ষা, এরপর সেই

সংক্রান্ত বিশ্লেষণ এবং শেষে অবস্থার বদলের জন্য কিছু পদক্ষেপ দেখা যায়, যা প্রয়োজনীয় সৃজনক্ষমতা বাড়ায়, শিশুদের সার্বিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অনুভূতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক অভ্যাসকে বাড়িয়ে তোলে ইত্যাদি। গ্রামের লক্ষ লক্ষ শিশুরা কি এই পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে এবং গ্রামীণ ভারতের আমূল পরিবর্তন ঘটবে? এন. সি. এফ.– ২০০৫ ও এই একই ভাবনা ব্যক্ত করেছে। কোনও কোনও রাজ্যের সরকার হয়তো একে প্রয়োগের চেষ্টা করবে। আবার অনেকে হয়তো চলতি পদ্ধতির পাশাপাশি এই ভাবনাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হবে। দিগন্তর-এর "আপনে আস পাস" এবং উত্তরাখণ্ড সেবা নিধির "আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার লাইফ" এমন বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য বইও নিশ্চয় লিখতে হবে। প্রতিটি রাজ্যকেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্র নির্বাচন করে এবং এই কাজ করার জন্য সঠিক দিশা ও যথাযথ কার্যপ্রণালী ঠিক করে এগিয়ে আসতে হবে। বিষয়টি আরও বিস্তারে বোঝানোর জন্য আমি এখানে এস. ই. সি. এম. ও. এল, লাদাখ-এর সোনম ওয়াঙ্গেহাকের একটি উক্তির উল্লেখ করছি; "কখনও কখনও স্কুল বন্ধ থাকলেও অন্যভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তা উপযোগী হতে পারে। উদাহারণ হিসাবে বলা যায়, গ্রীষ্মকালে স্কুল খোলা থাকে, যখন শিশুরা খামার থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। শিশুদের কৃষিকাজ শেখানোর বিষয়টি নিশ্চিত করার অর্থ এই নয় যে, তাদের জন্য স্কুলে কৃষি বিষয়ক ক্লাসের বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু যদি গ্রীষ্মের সময় শুধু একমাস স্কুল বন্ধ থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাঠ থেকে শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারবে।"

কবিকে নতুন করে চেনা

গ্রামন্নোয়ন চিন্তাবিদ ও অধ্যাপক অশোক সরকার এবং স্বাতী ঘোষ এর খুব ভাল একটা বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'কবির পাঠশালা-পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ইতিহাস' এবং এর প্রকাশক 'আনন্দ-সিগনেট'।

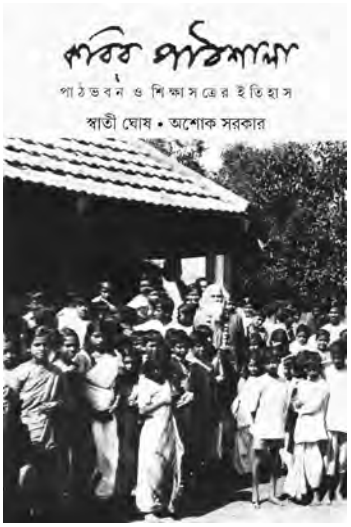

এই বিষয় নিয়ে অনেক বই-ই আছে, কিন্তু এই বইটি খুব ভালভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই বই শুধু পণ্ডিতরা নয়, যদি সাধারণ মানুষরাও পড়েন, তাহলে তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার ফলিত রূপ নিয়ে অনেক কিছু জানতে-বুঝতে পারবেন। এই বইটিতে সবমিলিয়ে আছে ৩৫ টি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায় যেন একেকটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ।

কিন্তু প্রাক্তন গ্রামন্নোয়ন কর্মী অশোক সরকার মূল জোরটা দিয়েছেন 'শিক্ষাসত্রের' ওপরে। 'পাঠভবন'-এর ইতিহাস খুব গুরুত্ব দিয়ে তিনি লিখেছেন কিন্তু মূল আবেগটা দিয়েছেন এই 'কবির স্কুলে'। অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে তিনি তুলে ধরেছেন এর ইতিহাস, আর কোথায় এর ভিতরে অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা তিনি তুলে ধরেছেন অপার মুন্সীয়ানায়।

এত সহজে যে এত জটিল তত্ত্ব বলা যায়, তা অশোক সরকার এবং স্বাতী ঘোষ আমাদের দেখিয়ে দিলেন চোখে আঙুল দিয়ে। পড়তে পড়তে আমরা ভুলে যাই যে এটা একটা জটিল বিষয়ে লেখা বই। 'শিক্ষাসত্র' নিয়ে তাঁর যা বিশ্লেষনাত্মক লেখা তা প্রতিটি শিক্ষকের পড়া দরকার। 'শিক্ষাসত্র' নিয়ে যে ৮ টি অধ্যায় আছে, তার প্রতিটিই অসাধারণ। এখানে লেখক-লেখিকা দেখাবার প্রয়াস নিয়েছেন যে কিভাবে শিক্ষাসত্রই হয়ে উঠেছিল কবির প্রধান স্বপ্ন। তিনি খুব ভাল ভাবে দেখিয়েছেন যে এই শিক্ষাসত্র শুধু গ্রামীণ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দক্ষতা বৃদ্ধির জায়গা ছিলনা। বরং এর পাশাপাশি তা ছিল অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে এমন একটা প্রজন্ম তুলে আনার জায়গা, যেখানে প্রশিক্ষিত হবেন সেইসব যুবক, যাঁরা গ্রামে বহন করে আনতে পারবেন তার স্বপ্নের শ্রী। আসলে কবি যে সারাজীবন ধরে একটা 'শ্রী' খুঁজে চলেছিলেন আর সেই 'শ্রী' তত্ত্ব প্রয়োগের জন্যই যে তিনি শান্তিনিকেতন-এর সম্ভ্রান্ত পরিবেশের বাইরে খুঁজে নিয়েছিলেন প্রান্তিক গ্রামের বাস্তবতা তা প্রতি পরতে পরতে তুলে এনেছেন লেখক। এই বইতে 'শিক্ষাসত্রের প্রথম দু' বছর' নামে একটা অসাধারণ অধ্যায় আছে, যেখানে লেখক কবির ভাবনার দিগন্তগুলি উন্মোচন করেছেন। এখানে অন্য একটা অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন গান্ধীজির 'শিক্ষাসত্র' উদ্যোগ পরিদর্শনের কথা। তবে সবচেয়ে জরুরী অধ্যায় 'শিক্ষাসত্রে নতুন শিক্ষাক্রম'। আজ যাঁরা নতুন 'শিক্ষা' নিয়ে ভাবছেন অথবা ভাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁদের এই অধ্যায় খুব ভাল ভাবে পাঠ করা দরকার।

কিন্তু মন খারাপ হয়ে যাবে রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরের ইতিহাসের দিকে তাকালে। আসলে সদ্য স্বাধীন একটা দেশে হয়তো সম্ভব ছিলনা এত সাহসী চিন্তা করার। এখানে লেখকবৃন্দ দেখিয়েছেন কিভাবে ধীরে ধীরে পুরো বিকল্প উদ্যোগগুলো আহরিত হয়ে গেল রাষ্ট্র দ্বারা।

এই বই আমাদের উন্নয়ন ও শিক্ষা নিয়ে ভাবিত প্রতিটি মানুষের কেনা ও পড়া উচিত।

বিদ্যালয়ে আধ্যাত্মিকতা

ড. অশোক সরকার

আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ডেভেলপমেন্ট-এর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। স্বাতী ঘোষ ও অশোক সরকারের ''কবির পাঠশালা'' নামক বই থেকে এই লেখাটি চয়ন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষা শুধু ইন্দ্রিয়ের নয়, শুধু জ্ঞানে নয়, শিক্ষা হলো হয়ে ওঠা। মানুষ যখন আনন্দ পায়, তখন তার জীবনের এই বাড়তি জিনিস আরও বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকে। ''আমাদের ওখানে দেড়শো দুশো ছেলের প্রাণের আনন্দ প্রতিদিন নানাভাবে ওখানকার বাতাসের সঙ্গে মাটির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে – ওখানে একটি অদৃশ্য আনন্দ নিকেতন সৃষ্টি করে চলেছে''। ১৪১

বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিকতাকে আমরা এই পটভূমিতে বুঝতে চাইব। আধুনিক শিক্ষা মানুষকে কিছু বিষয়ে অবহিত করবে, কিছু বিষয়ে দক্ষ করবে, সার্বিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি করবে, এবং তার সঙ্গে জগতের সৃষ্টির সব কিছুর প্রতি মানবিক সংবেদনশীলতা তৈরি করবে– আধুনিক শিক্ষার ভাবনার গন্ডির সীমানা ওই পর্যন্তই। কিন্তু তার সঙ্গে শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতাকে স্থান দিতে গেলে কী লাগে? কেনই বা আধ্যাত্মিকতাকে স্থান দেব? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার একটি বিশেষ দিক আমাদের আবার স্মরণ করতে হয় – রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র জ্ঞান ও মনের চর্চার স্থান ছিল না। একটি উন্নত সমাজ তৈরির স্বপ্নও ছিল। নিজেকে জানা, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর সেখান থেকে সমাজের ঐশ্বর্য রচনাতে ওই আধ্যাত্মিকতার সার্থকতা। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি তৈরি করা নয়, কবির ভাষায়, স্কুলটি হবে একই সঙ্গে একটি বসবাসের গৃহ আবার অন্যদিকে একটি ধর্মস্থান। অর্থাৎ তিনি এই বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একটি জীবনের কথাও ভেবেছিলেন– শহরের বস্তুতান্ত্রিক আকর্ষণ থেকে দূরে, যেখানে নতুন করে মহৎ জীবনের এক সাধনাকে জীবনের সাধনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

জীবন যাপন করতে গেলে শরীরের কিছু মৌলিক প্রয়োজন আছে। খাদ্য, আবাস, বস্ত্র। জ্ঞান ও শারীরিক শ্রম দিয়ে তা পাওয়া যায়। আশ্রমে সেই শারীরিক শ্রম ও জ্ঞান দুয়েরই ব্যবস্থা ছিল। বাগান করা, রাস্তা নির্মাণ করা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষাসত্রে শরীরের কাজ আরও বিস্তৃত হবে, আরও গুরুত্ব পাবে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''.....দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়ামচর্চা বলছি নে। দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা ..... দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের যোগ আছে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস''। ১৪২

আধ্যাত্মিকতার যে চারটি মূল মাত্রা আছে, তার মধ্যে এই শরীরের মাত্রাকে প্রাথমিক ও নীচের মাত্রা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় মাত্রাটি হল জ্ঞানের স্তর। শুধু ব্যাবহারিক জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান দিয়ে দেহের কাজের সুরাহা হয় ও জীবনযাপনের বন্দোবস্ত হয় শুধু সেই জ্ঞানই নয়, প্রকৃতি ও তার সূক্ষ্ম নিয়মগুলিকে গভীরভাবে বুঝতে হলে জানতে হলে যে জ্ঞানের দরকার হয়, সেই জ্ঞান। যে জ্ঞান থেকে বিশ্বচরাচরের ব্যাপ্তিকে বৈচিএ্যকে সূক্ষ্মতাকে বোঝা যায়, কিছুটা হলেও অনুভব করা যায়, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান। সেই জ্ঞান আহরণের চেষ্টা যথাসম্ভব হয়েছে বিদ্যালয়ে।

সামর্থ্যকে ভর করে প্রাকৃতিক জ্ঞান, অ্যাস্ট্রনমি, গণিত,জীববিদ্যা, এবং ক্রমশ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার চর্চাও এসেছে বিদ্যালয়ে। শরীরের শিক্ষার সঙ্গে এর নিবিড় যোগও ছিল। শুধু বই পড়ে নয়, অন্য নানারকমের উপাদান-উপকরণের মাধ্যমেও এই জ্ঞান আহরণের চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে। টেলিস্কোপ দিয়ে নক্ষত্র পরিচয়, বীজকে অঙ্কুরিত করে উদ্ভিদের প্রাণরস বোঝানো, গুটিপোকার জীবনচক্র বোঝা, সহজ দৈনন্দিন উপকরণের মাধ্যমে গণিত শেখা– অনেক কিছুরই অভ্যাস ও চেষ্টা হয়েছে এই স্কুলে।

কিন্তু এই বিশ্বজ্ঞানের ওপারেও জগৎ আছে। তাকে আধ্যাত্মিকতার তৃতীয় মাত্রা বলা যেতে পারে। তাকে আমরা মানব বোধের জগৎ, মানবমনের জগৎ বলতে পারি। সেই বোধের জগৎ তৈরি হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে, সংগীত, কলা, নাটক, কবিতা, গদ্য প্রভৃতি থেকে। জ্ঞানের জগৎ একদিকে, বোধের জগৎ আরেকদিকে। জীবনকে যাপন করতে গেলে যেমন ব্যাবহারিক জ্ঞান আর কিছুটা বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জ্ঞান লাগে, জীবনকে ধারণ করতে গেলে লাগে জীবনের নানা রস সম্পর্কে বোধ। জীবন যাপন হল শ্রমের জীবন, জীবন ধারণ হল আনন্দের জীবন, উপলবদ্ধির জীবন।

''..... আমাদের ছেলেরা বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ায়, জোৎস্না রাত্রিতে আনন্দ ভোগ করে, তারা রৌদ্রকে ডরায় না, তারা গাছে

বসে পড়া করে– আমি নিয়মগুলিকে সামান্য জিনিস মনে করি নে। চারিদিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, আনন্দের ছোটবড় নানা যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড় লাভ তা বলে শেষ করা যায় না। ....” ১৪৩

শরীরের কাজ যদি দেহ ও মনকে সবল করে, প্রাকৃতিক জ্ঞান যদি মানুষের যুক্তির ধারকে শাণিত করে আর জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করে, তা হলে তাদের সঙ্গে বোধের জগৎ যুক্ত হলে তা মানুষকে কবিরই ভাষায় ওই “হয়ে উঠতে” সাহায্য করে।

আধ্যাত্মিকতার চতুর্থ ও শেষ দিকটি হল, উপরের এই তিনটি মাত্রাকে এক সূত্রে গাঁথার সাধনা । এইখানে শরীরের সাধনা, জ্ঞানের সাধনা, বোধের সাধনা সব একাকার হয়ে এক পরমের খোঁজ করে। এই তিনটি সাধনা যে আসলে একটি পরমের সাধনা, সেইটি কার্যক্ষেত্রে ও জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রূপান্তরিত করার কাজটি সহজ নয়। এই পরমের সাধনাকে শুধুমাত্র সকাল-সন্ধ্যার উপাসনা, বুধবারের মন্দির, ধর্মশাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ ও নীতিশাস্ত্র পড়ার মধ্যে সীমিত রাখলে তা হয় না। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের মধ্যে, প্রতিটি স্পর্শের মধ্যে, সেই পরমকে উপলবদ্ধি করতে হয়, খুঁজতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজের মধ্যে সেই পরমকে খোঁজার মধ্যেই বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ নিহিত ছিল। তবে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে যতটা স্পষ্ট ছিল, অন্য সবার কাছে ততটাই স্পষ্ট ছিল, এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই আছে,

“.... Having this ideal of a school in my mind which should be a home and temple in one, where teaching should be part of a worshipful life I selected the spot away from all distractions of the town, hallowed by the memory of a pious life whose days were passed there in communication with God.

You must not imagine that I have fully realized my ideal – but the ideal is working itself out through all the obstacles of the hard prose of modern life...

The first help that our boys get here on this path is from the cultivation of love of nature and syampathy with all living creatures. Music is of very great assistance to them – songs being not of the ordinary hymn type, dry and didactic, but as full of lyric joy as the author could put in them....”১৪৪

শিক্ষা যদি মনের সমৃদ্ধি না জোগাতে পারে, অনুভূতি বা উপলব্ধির উদ্দীপনা জোগাতে না পারে তা হলে তা ব্যর্থ। মনের আর বোধের উদ্ভাস জাগাতে গেলে, তাকে জীবন যাপন ও জীবন ধারণের প্রতিটি স্তরে জায়গা নিতে হয়। বিদ্যালয়ে আর আশ্রমের সংস্কৃতিচর্চা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জীবনের পরতে পরতে জায়গা নিয়েছিল।

“I tried my best to develop in the children of my school the freshness of their feeling for Nature, a sensitiveness of soul in their relationship with their human surroundings, with the help of literature, festive ceremonials and also the religious teaching which enjoins us to come to the nearer presence of the world through the soul, thus to gain it more than can be measured....I prepared for my children a real home coming into this world” ১৪৫

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি, বৈশাখ থেকে বর্ষা, শরৎ হেমন্ত হয়ে চৈত্র – সময় ও কালের সব মুহূর্তই যে শিখবার, জানবার, খুঁজবার আর গড়বার জন্য, হয়ে উঠবার জন্য উপযুক্ত, শান্তিনিকেতনের অধিবাসী ছাত্র-শিক্ষক-কর্মীদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল প্রতি পদে পদে। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদেরকে যে অধ্যাত্মবোধে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, তা হল বিশ্বমানের ইতিহাসকে অখন্ড করে দেখা। তাই আশ্রমের শুভকাজে ইংরেজ বা পশ্চিমি সাধক কেউ ব্রাত্য ছিলেন না। পরমসত্যকে তিনি কোনও নাম দিয়ে খণ্ডিত করতে চাননি। ছেলেদের মনে এক অখণ্ড পূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিচর্চা জীবনের এমনই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল যে তাকে একটা বিশেষ ধরনের জীবনের বাহক বলা অসংগত হবে না। শান্তিনিকেতনের জীবনে বহু দশক পর্যন্ত এই জীবনাদর্শ মানুষকে প্রভাবিত করেছে, আকৃষ্ট করেছে– এখনও করছে। এখানে যে একটা জিনিস লক্ষ করার তা হল, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ভাবনার বিবর্তন, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি প্রথম বালকদের সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত, মঙ্গলব্রতে দীক্ষিত করছেন।

সত্যসন্ধানে, দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, ভাল গুণের উন্মেষের উপর জোর দিচ্ছেন। সেই দিনেই গান লিখছেন, “মোরা সত্যের পরে মন, আজ করিব সমর্পণ।....” এইটিই ছিল প্রথম যুগের আশ্রমসংগীত। লক্ষ করার যে ধর্মাচরণের কথা নেই কিন্তু একধরনের didactic বা নীতির নির্দেশ আছে। কিছু বছরের মধ্যে এই ‘ভাল হওয়া,’ ‘সহনীয়তা’, ‘সত্য পথে থাকা’র বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হচ্ছেন। ব্রহ্মের প্রসঙ্গ এখানে যে ভাবে আনছেন পরে তা আর থাকছে না। আশ্রমসংগীত হচ্ছে “আমাদের শান্তিনিকেতন” আনন্দপথেই মুক্তির আহ্বান সেই সংগীতে, সত্যের পথে নয়।

আদর্শ শিক্ষকের গল্প

(১) গ্রামের নাম সৃজনপুর। পিছিয়ে পড়া গ্রাম হলেও নামটার মধ্যেই সৃষ্টির একটা ছবি ভেসে ওঠে।

(২) প্রকৃতি যেন এই গ্রামটাকে অপরূপ শোভায় সাজিয়ে দিয়েছে।

(৩) এই গ্রামে একটি মাত্র জুনিয়র হাইস্কুল প্রকৃতির মাঝে বড় বেমানান হয়ে কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

সদ্য এস এস সি পাশ করে আদর্শবাবু এই গণ্ডগ্রামের স্কুলে প্রথম ঢুকেই চমকে উঠলেন, এ কী ... এটা স্কুল না অন্য কিছু ?

(৪) গ্রামের ছেলে মেয়েরা এই স্কুলে আসার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। কিছু ছেলে মেয়েরা এদিক ওদিক ঘুরছে। মাস্টার মশাইরা নীরস পাঠদান করাতে করাতে ক্লান্ত হয়ে স্কুল বারান্দায় হাত পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। স্কুলটা যেন প্রাণহীন মরা গাছের মতো কোন রকমে টিকে আছে। আদর্শ বাবু চিন্তা করলেন, আগে আমাকে অবস্থাটা বুঝতে হবে, এর কারণটা জানতে হবে।

(৬) পরের দিন স্কুলে এসে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে করতে তরুণ মাস্টার আদর্শবাবু বললেন, গ্রামের ছেলে মেয়েদের জীবনটাকে শুধু বইয়ের মধ্যে আটকে না রেখে গ্রামের বাস্তব জীবন যাপনের চাহিদার সঙ্গে মেলানো যায় না?

(৭) হেড মাস্টারমশাই বলেন, আপনি এভাবে কেন ভাবতে চাইছেন?

(৮) আদর্শ বাবু বললেন, আমরা সিলেবাসের যে সব বিষয় নিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াই, আপনার কি মনে হয় বেশিরভাগটাই শহরকেন্দ্রিক নয়?

(৯) হেড মাস্টারমশাই বললেন, ঠিক কথা কিন্তু কিভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে। আর সেটা করতে হবে সরকারী সিলেবাস কে অক্ষুণ্ণ রেখে। আপনাকে একটা অনুরোধ করবো, যদি আপনি পারেন গ্রামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্কের ভাঙা সেতুটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে তাহলে এই বিদ্যালয় আপনাকে সারা জীবন মনে রাখবে।

প্রকৃতির রূপ যেমন পাল্টায় তেমনি স্কুলটাও একটু একটু করে পাল্টাতে শুরু করলো এই তরুণ মাষ্টারমশায়ের আগমনে। অনেক ভাবনা ও স্বপ্ন নিয়ে এই গণ্ড গ্রামের স্কুলটাকে বেছে নিয়েছেন তিনি।

(১০) স্বপ্নের ফেরিয়ালার মত আদর্শবাবু তার স্বপ্নকে বাস্তবে রুপায়ণ করার জন্য প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে প্রধান, কর্মচারী ও সমস্ত গ্রাম সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করলেন যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কি ভাবে গ্রামের প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে স্কুলের সিলেবাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায় ।

(১১) এক দিন আদর্শবাবু স্কুল ছুটির পর গ্রামে ঘুরতে

বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে কিছু গ্রামের মানুষের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বললেন এবং গ্রামের হতশ্রী চেহারা দেখে বড়ই মর্মাহত হলেন। মনে মনে ভাবলেন এই যদি গ্রামের চেহারা

হয় তাহলে স্কুলের এই অবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক।

(১২) গ্রামে ঘুরে আদর্শবাবুর মনে হল গ্রামের মানুষের সঙ্গে বসে স্কুলে গ্রামীণ উপযোগী শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার। সেই মতো দিন ঠিক করে আলোচনা সভা করলেন। পরিবার এবং গ্রামবাসীদের কি দায়িত্ব তা বিস্তৃত ভাবে বললেন। যারা মিটিঙে ছিলেন তাঁরা স্কুলের জন্য সবরকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

(১৩) এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। যারা গ্রামের মিটিঙে এল না তাদের মধ্যে থেকে কয়েক জন স্কুলে এসে চড়াও হল। তারা আদর্শ বাবুকে বলল, শুনলাম আপনি নাকি হতে কলমে কি সব শেখাবেন? তা হলে কি আমাদের ছেলে মেয়েরা চিরকাল চাষা হয়েই থাকবে?

(১৪) আদর্শ বাবু ভয় না পেয়ে তাদের কথাগুলি ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আসলে সব বাবা মায়েরা আশা করেন স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে তাঁদের ছেলেশমেয়েরা শহরে চাকরি করতে যাবে, বাবা মায়ের মুখ

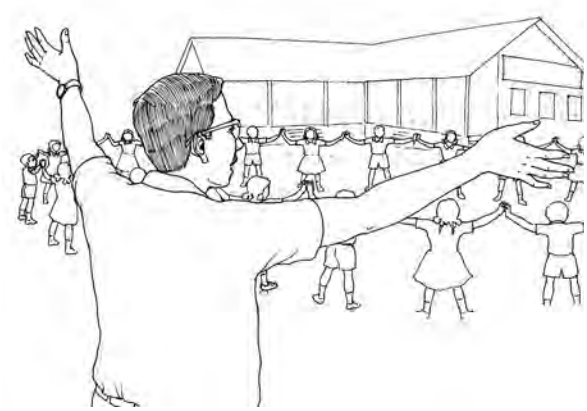

উজ্জ্বল করবে। আপনারা মনে রাখবেন সবাই চাকরি পাবেনা। যারা চাকরি পেল না তাদের কি হবে? আবার গ্রামের জন্য যে ধরণের দক্ষতা লাগে সেটাও শিখলনা। তাহলে উপায় বেকার জীবনের বোঝা বয়ে চলা।

(১৫) আবার অন্য দিকটাও দেখুন শহরে যারা চাকরি পাবে তাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকবে, অবশেষে গ্রামের শিকড়ের টান আর অনুভব করবে না। গ্রামের মানুষ হিসাবে তাদের অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে যাবে।

(১৬) আদর্শবাবুর কথা শুনে তাদের ভুল ভাঙল। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, "এই স্কুলের জন্য আমরা যদি কোন সাহায্য করতে পারি তাহলে আমাদেরই মঙ্গল। তার সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদেরই মঙ্গল হবে। এই সার কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি।

(১৭) নানা ঝড়ঝাপটা সামলে আদর্শ বাবুর স্বপ্ন একটু একটু করে বাস্তবে রুপ নিতে শুরু করল। গ্রামেরই একজন লোকশিল্পী নলিনী খুড়ো স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে স্কুলের ছেলে মেয়েদের স্থানীয় সংস্কৃতি নৃত্য গীত শেখাতে লাগলেন। ছেলে মেয়েরা খুব আনন্দ সহকারে কাজ শিখতে থাকল।

(১৮) একদিন আদর্শ বাবু সব ছাত্রদের ডাকলেন। সবাই

হৈ হৈ করে এসে স্কুলের মাঠে জড়ো হল। আদর্শ বাবু লক্ষ্য করলেন ছেলে মেয়েদের চোখ মুখে এক অনাবিল আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছে।

(১৯) আজ তোমাদের নতুন মাস্টার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় করাবো। ছাত্র ছাত্রীরা অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল খুব ভালো, খুব ভালো। অবশেষে ঐ গ্রামের এক অভিজ্ঞ কৃষক এগিয়ে এলেন। আদর্শ বাবু বললেন উনি তোমাদের কৃষিকাজের মাস্টারমশাই, তোমাদের উনি চাষবাসের কাজ শেখাবেন।

(২০) ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে একজন বলল মাস্টারমশাই উনি তো আমাদের গ্রামের তারিণী জেঠু। আমাদের নদীর ধারে পাশের মাঠটায় চাষ করেন। তারিণী জেঠু বলল ঠিক বলেছো। তোমরা তো সব সময় আমার মাঠের পাশ দিয়েই স্কুলে যাতায়াত কর। ছাত্র ছাত্রীরা সবাই হৈ হৈ করে বলে উঠলো আজকে তুমি আমাদের মাস্টার মশাই।

(২১) তারিণী জেঠু বিনয়ের সঙ্গে বলল, না গো না আমি তোমাদের মাস্টার টাস্টার নই, আমি ক্ষেতে কাজ করি। কৃষি

কাজ আমার প্রাণের ধন। পঞ্চায়েত প্রধান আমাকে বলল আর স্কুলটা তো আমাদের গ্রামেরই। ওখানে তো আমাদের ছেলে

মেয়েরাই পড়ে তাই এলাম।

(২২) আদর্শ বাবু বললেন, ওনার কাছে তোমরা আজ শিখবে কেমন করে সব্জি বাগান করতে হয়। তোমাদের সঙ্গে আজকে উনি সময়টা কাটাতে এসেছেন। তারপর কৃষিকাজের মাস্টার মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, এবার তাহলে আপনি আপনার কাজ শুরু করে দিন।

(২৩) তারিণী জেঠু স্কুল প্রাঙ্গণের একটা কোণে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে। তারিণী জেঠু ছেলে মেয়েদের বোঝালেন প্রথমে সব্জি বাগান করতে গেলে কি ভাবে জমি তৈরি করতে হয় তা তোমরা দেখ।

(২৪) জমিটায় আগাছায় ভরে ছিল। তারিণী জেঠু প্রথমে দু হাত দিয়ে আগাছাগুলো তুলে ফেলে দিতে থাকলেন। তাঁর দেখাদেখি ছাত্র ছাত্রীরাও আগাছা তুলতে লাগলো। তারপর তিনি কোদাল নিয়ে মাটি কোপাতে লাগলেন।

(২৫) ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করছে দেখে এগিয়ে এলেন হেড মাস্টার মহাশয় ও আদর্শবাবু।

হেড মাস্টার মহাশয় কাজ দেখে খুশি হয়ে আদর্শবাবুকে বললেন, আপনি ঠিক বলেছিলেন, বাচ্চাদের হাতে কলমে কিছু শেখালে ওরা খুব আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে।

(২৬) কৃষি কাজের মাস্টার মশায়ের সাহায্যে পঞ্চায়েতের দেওয়া ফসলের বীজ লাগাতে লাগাতে ছেলে মেয়েরা সব ঘেমে চুপচুপ হয়ে গেল। এই কাজের মধ্যে এত ওরা আনন্দ পেল যে, সেদিন থেকে কৃষক তারিণীজেঠু ছেলে মেয়েদের কাছে অন্য মানুষ হয়ে গেল। দূর থেকে ছেলে মেয়েরা দেখলেই ওরা চেঁচিয়ে উঠতো– ওই যে আমাদের তারিণী জেঠু কৃষিকাজের মাস্টার মশাই।

(২৭) আদর্শ বাবুর উদ্যোগে জরাজীর্ণ স্কুলটা হয়ে উঠলো ছেলে মেয়েদের কাছে এক স্বর্গ। নিজেদের হাতে লাগানো বীজের গাছ হয়ে ওঠা প্রকৃতির এই বিস্ময় ছেলে মেয়েরা বেশ অনুভব করতে পারল।

(২৮) প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ সব্জি বাগানটা কতদূর কি হল, এসে হেডমাস্টার মশাই ও আদর্শ বাবুকে খবর দিতে থাকল। গ্রামের মানুষেরাও দেখভাল করতে লাগল। বাগানের কোন সমস্যা হলে তারিণী জেঠু কে ডেকে আনত।

রবিবার দিনে স্কুল বন্ধ থাকলেও বাচ্চারা স্কুলে বাগান দেখতে ছুটে আসতে লাগল।

(২৯) কৃষিকাজের মাস্টার মশাই স্কুলের পাশের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ছেলে মেয়েদের চেনাতে শুরু করলেন বিভিন্ন ফসলের উপকারি অপকারী-পোকামাকড়। গ্রামে যে সমস্ত ফল গাছ, আসবাবি গাছ, ঔষধি গাছ আছে সেইগুলোকে গ্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেনাতে শুরু করলেন। ছেলে মেয়েরা অনেক গাছ চিনতে শিখল।

(৩০) হঠাৎ একদিন স্কুলে এসে হাজির এক গ্রামবাসী। তিনি আদর্শ বাবুকে ডেকে বললেন, আমাকে একটিবার সুযোগ দেবেন? আমি শোলা ও বাঁশ দিয়ে নানা রকম জিনিস বানাতে পারি। কয়েক বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আমি এই স্কুলের আগামী প্রজন্মের হাতে সেই জ্ঞান তুলে দিতে চাই। আমি মন প্রাণ দিয়ে ওদেরকে যাতে এই কাজ শেখাতে পারি তার অনুমতি দিন।

আদর্শ বাবুর মাথায় একটা নতুন ভাবনা কয়েকদিন ধরে ঘুর ঘুর করছিলো সেই মত মাতা শিক্ষা কমিটির মিটিঙে প্রস্তাব

রাখল গ্রামের কিছু অভিজ্ঞ মানুষ যখন স্বইচ্ছায় এগিয়ে এসেছে এবার থেকে যদি কমিউ নিটি রিসোর্স ওরগানাইজার

রাখা যায় তাহলে কেমন হয়? আমরাত সব বাইরে থেকে আসি তারা ত গ্রামেরই লোক তাদের পক্ষে সুবিধে হবে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি কে যোগাড় করা। তাহলে কজটা আরও সহজ হবে স্থায়ী হবে। ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরণের জিনিস শিখতে পাড়বে। সবাই এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালো।

(৩১) আদর্শ বাবু সেই গ্রামবাসী মানুষটিকে বললেন, এটা তো আপনাদের স্কুল, আপনাদের ছেলে মেয়েরাই পড়ে, এতে অনুমতির কি আছে? আপনি কাজ শুরু করে দিন। ঠিক আছে মাস্টার বাবু, আপনি আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে নমস্কার। এই বলে সে চলে গেল।

(৩২) আজকে স্কুলের ছেলে মেয়েদের বড় খুশির দিন, ওরা নিজের হাতে গাছের নার্সারির জন্য প্যাকেটে মাটি ভরছে। ওদের কাজ দেখতে আজ পঞ্চায়েত প্রধানও এসেছেন উৎসাহ দিতে।

(৩৩) দেখতে দেখতে ছেলে মেয়েদের পরম মমতায় ও যত্নে প্রকৃতির নিয়মে নার্সারির গাছগুলি বেড়ে উঠেছে।নার্সারি থেকে গাছগুলি নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণের চারি ধারে লাগাচ্ছে, আবার

সেই চারা বাড়িতেও তারা নিয়ে যাচ্ছে।

(৩৪) প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার দিন শিক্ষামূলক ছবি দেখানো শুরু হল। যেদিন দেখানো হয় সেদিন ছেলে মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। ছবি দেখতে দেখতে ওরা শিখল পুষ্টি-স্বাস্থ্য ও ব্যাবহারিক পরিচ্ছন্নতার নানা দিকগুলি। তারা বাড়িতেও এই স্বাস্থ্য নিয়ম চালু করে দিল।

(৩৫) আজ ছেলে মেয়েরা স্কুল খোলার অনেক আগে নতুন জামা কাপড় পরে স্কুলে এসেছে। আদর্শ বাবু এবং পঞ্চায়েত প্রধান ওদের নিয়ে যাবে গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থানে ভ্রমণ করাতে। এতদিন গ্রামের দাদুদের মুখে শুনে এসেছে সেখানকার কথা, আজ চাক্ষুষ তারা দেখবে দুটো নদী যেখানে এসে মিশেছে। আর দেখবে সেন আমলের ধ্বংসাবশেষ।

(৩৬) দুটি নদীর মিলন স্থল এবং সেন আমলের ধ্বংসাবশেষ অতি উৎসাহে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর আদর্শ বাবু ও প্রধান সাহেবকে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। এই ভ্রমণ ওদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে।

(৩৭) আদর্শ বাবুর আদর্শ স্কুলকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েতে

একটা সোরগোল পড়ে গেল। পঞ্চায়েত প্রধান ঐ গ্রামের যত প্রাথমিক স্কুল ও এম এস কে আছে, তাদের সব মাস্টার মশাইদের নিয়ে পঞ্চায়েতে মিটিং ডাকলেন, যাতে ঐ সব স্কুল প্রচলিত স্কুল শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সংযোজন ঘটাতে পারে। আদর্শ বাবুর স্কুলের উদাহরণ টেনে তিনি আলোচনা করলেন। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত উপসমিতি সব ধরণের সাহায্য করতেও প্রতিশ্রুতি দেয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মাস্টারমশাইরা নতুন দিশার সন্ধানে কাজে নামার অঙ্গীকার করেন।

(৩৮) দেখতে দেখতে আদর্শ বাবুর শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার পথ কে অনুসরণ করে পঞ্চায়েত এলাকার অন্যান্য গ্রামের স্কুলেও গ্রামবাংলার প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ঢেউ আছড়ে পড়ল। এই পথে সামিল হল পঞ্চায়েত ও গ্রামবাসী। জীবনের জন্য শিক্ষার এক নজির গড়ে তুলল গ্রাম পঞ্চায়েত, স্কুল ও গ্রামবাসীরা।

(৩৯) সৃজনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সৃজন মেলা করার উদ্যোগ নিল। ওই এলাকার সমস্ত স্কুলের ছেলে মেয়েরাই মেলায়

অংশগ্রহণ করবে। মেলার মহড়া চলল কয়েক মাস ধরে, সমস্ত স্কুল জুড়ে। কেউ নাচ করবে, গান করবে, নাটক করবে, ছবি

আঁকবে, স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে রচনার প্রতিযোগিতা হবে, ছেলে মেয়েদের হাতে কলমে তৈরি করা স্কুল বাগানের বিভিন্ন সব্জি ও শোভা বর্ধন করবে মেলায়। সৃষ্টির আনন্দে ওরা এখন মাতোয়ারা।

(৪০) সৃজন মেলাকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রাম গুলিতে উৎসবের চেহারা নিল। মঞ্চ বাঁধা হল পঞ্চায়েতের মাঠে। যথারীতি দুপুর দুটোয় আদর্শবাবুর স্কুলের ছেলে মেয়েদের দ্বারা সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মেলার অনুষ্ঠান শুরু হল। বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েদের পরিবেশিত নাচ গান নাটক আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। আর মেলার মাঠের স্টল গুলিতে বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েদের হাতের কাজ করা নানা ধরণের জিনিসকে ঘিরে যেন মানুষের ঢল নেমেছে।

(৪১) সৃষ্টির এই আনন্দযজ্ঞে যিনি প্রধান সেনাপতি, সেই আদর্শবাবু কিছু কথা বলার জন্য মঞ্চে উঠলেন। করতালির ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন প্রধান। এত আনন্দের মধ্যেও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে যেন একটা বিষাদের সুর গুনগুনিয়ে উঠল। কারণ তিনি অন্য

স্কুলে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। অন্য জেলায় তার বদলির অর্ডার এসে গেছে।

(৪২) ভাষণ দিতে উঠে আদর্শ বাবুর দু চোখ জলে ভরে উঠল। ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, আপনাদের সবার সাহায্য এবং পঞ্চায়েতের উদ্যোগ না হলে আমি জীবনশিক্ষার প্রদীপ ছেলে মেয়েদের অন্তরে জ্বালাতে পারতাম না। আর আমি আগামী প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে এটাই করতে চেয়েছি যে জীবনকে ঘিরেই শিক্ষা। জীবনকে নিয়েই শিক্ষা, জীবনের প্রয়োজনকে আত্মস্থ ও সম্পৃক্ত করেই শিক্ষা। আমি এটাই করতে চেয়েছি যে গ্রামের শিকড়ের সঙ্গে যেন অন্তরের যোগসাধন গড়ে ওঠে।

(৪৩) আদর্শ বাবুর কথা শেষ হলে, হাততালি পড়ল। কিছু দীর্ঘশ্বাস, কিছু উচ্ছ্বসিত অশ্রুকণা। তারপর স্কুলের সব ছাত্র ছাত্রীরা এসে আদর্শ বাবুকে ঘিরে নাচতে লেগে গেল আর গাইতে লাগল- যেতে নাহি দিব।

(৪৪) এদিকে এমন সময় মাস্টার মশাইয়ের বিদায় সম্বর্ধনার কথা শুনে একজন মহিলা ছুটে আসে। হাজির হয় বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। মাস্টার মশাইকে ভুলতে পারে না সে। মঞ্চে উঠে গিয়ে মাস্টার মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে নমস্কার

করে বলে, গ্রামের ছেলে মেয়েদের আপনি শুধু শিক্ষাই দেননি, মানুষের মত বাঁচার স্বপ্নও দেখিয়েছেন, গ্রামবাসীদের মনেও স্বপ্নের বীজ বপন করেছেন। আপনাকে আমরা কি করে ভুলবো বলে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

(৪৫) অবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মাস্টার মশাই মহিলাকে বললেন আপনাদের ও ছেলে মেয়েদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা থেকে বলতে হয় সেখানেই মানুষের বিদ্যা ও মানুষের সাধনা সত্য হয়, যেখানে সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে হয়। এই কথা বলে মঞ্চ থেকে নেমে যান তিনি।

(৪৬) কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রধান বললেন, শিক্ষার সব কিছুই আজ নতুন করে ভাবতে হবে। আজ যারা শিক্ষা নিয়ে ভাবছেন, কাজ করছেন, তাদের কাছে আদর্শ বাবু এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গেলেন। সৃজন মেলা শেষ হল কিন্তু সৃজন মেলার মধ্য দিয়ে আদর্শ বাবু যে সুর বেঁধে দিয়ে গেলেন, আকাশে বাতাশে সেটাই বাজতে লাগলো। সেখানেই মানুষের বিদ্যা ও মানুষের সাধনা সত্য হয়, যেখানে সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে হয়।

তথ্য যখন সত্যের মুখ

শিক্ষায় সামাজিক অংশগ্রহণ

নিয়ে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ন মন্ত্রকের

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস (এন এস এস ও)-এর সমীক্ষা

বেশিরভাগ দেশে সরকার শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন ও তার দেখভালের জন্য আর্থিক সক্ষমতার একটা বড় অংশ ব্যয় করে থাকে। যদিও এই ব্যবস্থার সুফল পেতে কোনও একক ব্যক্তিকে টিউশন ফিজ, এক্সামিনেশন ফিজ, বই-খাতার খরচ ইত্যাদি বাবদ অর্থ ব্যয় করতে হয়। বাজেট নথিতে এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক খরচের বিস্তারিত তথ্য থাকে। তবে কোনও একক ব্যক্তি এজন্য কত অর্থ খরচ করেন, পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে সেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাই ২০১৪ সালে সোসাল কনজাম্পশনঃ এডুকেশন বা সহজ বাংলায় শিক্ষায় সামাজিক অংশগ্রহণ

সংক্রান্ত সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল, (ক) ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে শিক্ষাকে অর্জন করার আগ্রহ কতটা রয়েছে,(খ) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও উৎসাহ বাড়ানোর যে সব ব্যবস্থা সরকারের তরফে দেওয়া হয়, তা ব্যবহারের অবকাশ কতটা রয়েছে,(গ) শিক্ষা খাতে পরিবার ভিত্তিক ব্যক্তিগত খরচ,(ঘ) স্কুলছুট এবং ছাত্রছাত্রীদের মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যা ও তার কারণ খুঁজে বের করার মাধ্যমে শিক্ষার অন্ধকারময় অংশের পরিমাপ করা, এবং(ঙ) ১৪ বছর ও তার বেশি বয়সীদের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান।

গোটা দেশজুড়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়। প্রাপ্ত নমুনা কেন্দ্রীয়ভাবে এন এস এস ও দ্বারা পরীক্ষার পর সমীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয়। ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছাড়াও সবকটি রাজ্যের মোট ৪,৫৭৭ টি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের ৩,৭২০টি ব্লকে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের ৩৬,৪৭৯ টি ও শহরাঞ্চলের ২৯,৪৪৭টি পরিবার ছিল।

সাক্ষরতার হার

বয়সসীমা	গোটা দেশে	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	ছেলে	মেয়ে
৭ বছর ও তার বেশি বয়সী	৭৫%	৭১%	৮৬%	৮৩%	৬৭%
১৫ বছর ও তার বেশি বয়সী	৭১%	৬৪%	৮৪%	X	X

নিকটবর্তী এলাকায় প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পর্যাপ্ততা

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে খুব বেশি ফারাক নেই। সমীক্ষায় দেখা গেছে, গ্রাম ও শহরে বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে স্কুল থাকার কথা বলেছেন ৯৯% পরিবার।

স্কুল	গ্রামাঞ্চলে বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে আছে	শহরাঞ্চলে বাড়ি থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে আছে
উচ্চ প্রাথমিক	৮৬% পরিবার	৯৬% পরিবার
মাধ্যমিক	৬০% পরিবার	৯১% পরিবার

৫ বছর ও তার বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পূর্ণ করার হার

গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল	ছেলেদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করার হার	মেয়েদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করার হার
গ্রামাঞ্চল	৪.৫%	২.২%
শহরাঞ্চল	১৭%	১৩%

নাম নথিভুক্তকরণ ও উপস্থিতি

সমীক্ষায় দেখা গেছে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল, উভয় ক্ষেত্রেই ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে খুবই অল্প সংখ্যকের (প্রায় ১%) স্কুলের খাতায় নাম থাকলেও তারা সেখানে যায় না।

বয়সসীমা	গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল	ছেলেদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার হার	মেয়েদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার হার
৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী	গ্রামাঞ্চল	৫৮.৭%	৫৩%
৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী	শহরাঞ্চল	৫৭%	৫৪.৬%

উপস্থিতির অনুপাত

ভারতের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে ছেলে এবং মেয়ে, উভয় ক্ষেত্রে প্রাথমিকে উপস্থিতির হার সর্বমোট প্রায় ১০০%

সর্বমোট উপস্থিতির অনুপাত

শিক্ষার স্তর	গ্রামাঞ্চল/শহরাঞ্চল	ছেলেদের উপস্থিতির হার	মেয়েদের উপস্থিতির হার
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক	গ্রামাঞ্চল	৯১%	৮৮%
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক	শহরাঞ্চল	৯৩% (প্রায়)	৯৩% (প্রায়)

প্রকৃত উপস্থিতির অনুপাত

বয়সসীমা	শ্রেণি	শিক্ষার স্তর	ভারতে ছেলেদের উপস্থিতির হার	ভারতে মেয়েদের উপস্থিতির হার
৬ থেকে ১০ বছর বয়সী	প্রথম থেকে চতুর্থ	প্রাথমিক	৮৪%	৮৩%

তবে এই সমীক্ষায় গোটা দেশে প্রবেশিকা স্তরে (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে) গ্রাম বা শহরাঞ্চলে ছেলে অথবা মেয়েদের প্রকৃত উপস্থিতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য ধরা পড়েনি।

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বর্তমান হার

বয়সসীমা	শিক্ষার ক্ষেত্র	ভারতে ছাত্রছাত্রীর হার
১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী	সাধারণ শিক্ষা	৮৫% (প্রায়)
১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী	প্রযুক্তিগত/পেশাগত শিক্ষা	১২.৬% (প্রায়)
১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী	বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২.৪% (প্রায়)

কোর্স অনুযায়ী শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার

শিক্ষার ক্ষেত্র	কোর্স	ছেলেদের অংশগ্রহণের হার	মেয়েদের অংশগ্রহণের হার
সাধারণ শিক্ষা	হিউম্যানিটিজ	৪৬%	৫৪%
সাধারণ শিক্ষা	সায়েন্স	৩৫%	২৮%
সাধারণ শিক্ষা	কমার্স	২০%	১৮%
প্রযুক্তিগত/পেশাগত শিক্ষা	ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৬%	২৯%
প্রযুক্তিগত/পেশাগত শিক্ষা	মেডিসিন (নার্সিং সহ)	৪%	১৪%

কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন

গ্রামাঞ্চলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে সমীক্ষায় সম্পূর্ণ উল্টো ছবি ধরা পড়েছে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে।

গ্রামাঞ্চলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর হার

প্রাথমিকে	উচ্চ প্রাথমিকে	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে	মেয়েদের উপস্থিতির হার
৭২%	৭৬%	৬৪%	৮৮%

শহরাঞ্চলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর হার

প্রাথমিকে	উচ্চ প্রাথমিকে	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে	ভারতে ছেলেদের উপস্থিতির হার	ভারতে মেয়েদের উপস্থিতির হার
৩১%	৩৮%	৩৮%	৮৪%	৮৩%

অবৈতনিক শিক্ষার হার

শিক্ষার স্তর	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে
প্রাথমিক	৯৪% (প্রায়)	৮৭%
উচ্চ প্রাথমিক	৮৯%	৮০%
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৫৮%	৫২%

মিড-ডে মিল

প্রাথমিক স্তরে দেশের ৬৩% ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ২৬% ছাত্রছাত্রী মিড-ডে মিল পেয়ে থাকে।

প্রাইভেট কোচিং

সর্বভারতীয় স্তরে দেশের প্রায় ২৬% ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট কোচিং নিয়ে থাকে।

হস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীর হার

দেশে প্রায় ৫% ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তিগত খরচ

সমীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে চলতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী পিছু গড় ব্যক্তিগত খরচ (হচ্ছে বা হবে) প্রায় ৬,৭৮৮ টাকা, প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য (বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া) এই খরচ ৬২,৮৪১ টাকা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই খরচ ২৭,৬৭৬ টাকা।

শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী পিছু এই খরচ ছিল ১০,০৮৩ টাকা, যদিও গ্রামাঞ্চলে এই খরচের পরিমাণ ২,৮১১ টাকা।

প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি সাহায্য প্রাপ্ত এবং সাহায্য প্রাপ্ত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে টাকা খরচ হয় তা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খরচের প্রায় ১.৫ থেকে ২.৫ গুণের মধ্যে ওঠানামা করে।

সাধারণ শিক্ষার খরচের প্রায় ৪৬% এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার খরচের ৭৩% ছিল কোর্স ফি থেকে।

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীরা ১৫% টাকা প্রাইভেট কোচিং-এর জন্য খরচ করেন। কিন্তু প্রযুক্তিগত/পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে (বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহ) এই খাতে ছাত্রছাত্রীরা ৩% টাকা খরচ করেন।

কখনও স্কুলে না যাওয়া এবং পড়াশোনায় ছেদ ঘটা মানুষের হার

ভারতে গ্রামাঞ্চলে ৫-২৯ বছর বয়সীদের প্রায় ১১% এবং শহরাঞ্চলের ৬% কখনও কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম নথিভুক্ত করাননি।

অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের স্কুলছুট/পড়াশোনায় ছেদ হওয়ার আনুপাতিক হার প্রায় ৩৩% এবং শহরাঞ্চলে ৩৮%

আবার স্কুলছুট হওয়ার কারণে সাধারণ নিয়মে ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মেয়েরা বিভিন্ন আর্থিক কাজের সঙ্গে যুক্ত (গ্রামাঞ্চলে ৩০% ও শহরাঞ্চলে ৩৪%), অন্যদিকে সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র তাদেরকে দমিয়ে রাখার কারণে মেয়েদের একটা বড় অংশ ঘরের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত (গ্রামাঞ্চলে ৩৩% ও শহরাঞ্চলে ২৩%)।

সমীক্ষা উঠে এসেছে, গ্রামাঞ্চলে ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের কখনও স্কুলে নাম নথিভুক্ত না করার প্রধান কারণ পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ না থাকা (ছেলেদের ৩৩% ও মেয়েদের ২৭%)। যদিও শহরাঞ্চলে এর কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে এই বয়সী ৩৩% ছেলেদের ও ৩০% মেয়েদের কখনও স্কুলে না যাওয়ার প্রধান কারণ আর্থিক প্রতিবন্ধকতা।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার

গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৬% পরিবার এবং শহরাঞ্চলের ২৯% পরিবারে কম্পিউটার রয়েছে।

২০১৪ সালের এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে প্রায় ২৭% পরিবারে ১৪ বছর বা তার বেশি বয়সী অন্তত একজনের কাছে ইন্টারনেটের সুবিধা ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই অনুপাতের হার ১৬% পরিবার এবং শহরাঞ্চলে ৪৯% পরিবার। ১৪ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ১৮% এবং শহরাঞ্চলের ৪৯% মানুষ কম্পিউটার ব্যবহারে সক্ষম ছিল।

শিক্ষকদের জন্য হেল্পলাইন

শ্রী দেবাশিস মন্ডল

(প্রাক্তন সদস্য, সিলেবাস কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

৯৪৩৩১২০২৬১

সময়ঃ সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা

সিয়াটেল ভাষণ

১৮৫৪ সালে ওয়াশিংটনের মহান সাদা প্রভু আমেরিকার আদিবাসী জনজাতিদের নিজস্ব ভুখন্ডের সুবিস্তৃত অংশ কিনে নিতে চেয়েছিলেন এবং তার মধ্যে আদিম জনজাতিদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও তিনি রাখতে চেয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে সিয়াটেলের প্রধান যা লিখেছিলেন, তা এখনো পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত সবচেয়ে সুন্দর এবং সুগভীর একটি দলিল।

তুমি কি করে কিনবে অথবা বিক্রি করবে আকাশ অথবা জমির উষ্ণতা? প্রস্তাবটাই আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য, আবাস্তব। তুমি যদি না জানো বাতাসের তরতাজা অনুভূতি, জলের ঝকঝকে ঘূর্ণি, তুমি কি করে তাদের কিনবে?

এই বসুন্ধরার প্রতিটি অংশই আমার আমাদের কাছে পবিত্র। প্রতিটি পাইনের ঝকঝকে প্রতিটি পাইনের সূচীমুখপত্র, প্রতিটি বালুকাময় সমুদ্রতট, ঘন অরন্যের কুয়াশা, প্রতিটি গুনগুন করা কীটপতঙ্গ আমাদের স্মৃতিতে–সত্তায়–অভিজ্ঞতায় পবিত্র, প্রতিটি বৃক্ষের অন্তরে যে বহমান ধারা তা বহন করে নিয়ে চলেছে আমাদের পূর্বপুরুষের পবিত্র স্মৃতি।

প্রতিটি সাদা মানুষ যখন নক্ষত্রে মিলিয়ে যায় তখন ভুলে যায় তার জন্মভূমি দেশ মরুভূমি। আমাদের মৃত মানুষেরা কখনো ভোলে না এই সুন্দর বসুন্ধরা, যে বসুন্ধরা তার মা। আমরা এই বসুন্ধরার অংশ এবং বসুন্ধরাও আমাদের অংশ, প্রতি সুগন্ধি ফুল আমাদের ভগিনীসম, প্রতিটি হরিণ, ঘোড়া, বৃহৎ ঈগল আমাদের ভাতৃসম, প্রতিটি পর্বতের শিখর, তৃণভূমির সিক্ততা, ঘোড়ার এবং মানুষের দৈহিক উষ্ণতা আমাদের একই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত।

যখন ওয়াশিংটনের শ্বেতপ্রভু আমাদের কাছে বার্তা পাঠায় আমাদের জমি কিনে নেওয়ার জন্য সে হয়তো বেশি কিছুই চায়। তিনি আরো বলেন যে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হবে একটা সংরক্ষিত স্থানের, যেখানে আমরা জীবন অতিবাহিত করতে পারবো অতি আরামদায়ক ভাবে। তিনি হবেন আমাদের পিতা, আর আমরা হবো তার সন্তানসম। তাই আমরা বিবেচনা করে দেখবো তার প্রস্তাব। কিন্তু এটা খুব সহজসাধ্য নয়। কারণ এ ভূমি আমাদের কাছে পবিত্র। প্রতিটি উজ্জ্বল জলবিন্দু যা নদী এবং ঝর্ণা দিয়ে বয়ে চলেছে, তা আমাদের কাছে শুধু জল নয়, বরঞ্চ আমাদের মহান পূর্ব পুরুষদের রক্ত বিন্দু। আমরা যদি আপনাকে বিক্রি করি আমাদের এই পবিত্র ভূমি, তবে মনে অবশ্যই রাখবেন এ ভূমি পবিত্র ভূমি এবং আপনার সন্তান-সন্ততিদেরও শেখাবেন সে কথা। বিশেষত তাদের জানাবেন কিভাবে স্বচ্ছ জলের ভৌতিক প্রতিচ্ছবি কিভাবে আমাদের জীবনের ঘটনা এবং স্মৃতির কথা বলে। জলের প্রতিটি গুঞ্জন আমার পিতৃপুরুষ প্রপিতামহের কণ্ঠস্বর। নদীরা আমাদের ভাই, তারা আমাদের তৃষ্ণা মেটায়। নদী রয়ে নিয়ে চলে আমাদের বালতি এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জোগায় খাদ্য যদি আমরা আপনাকে বিক্রি করি আমাদের ভূখন্ড তবে আপনার সন্তান-সন্ততিদের জানাবেন নদীরা আমাদের ভ্রাতৃসম আপনাদেরও এবং এখন থেকে আপনিও নদীকে দেবেন ভ্রাতৃসম ভালবাসা।

আমরা জানি সাদা মানুষেরা বোঝে না। আমাদের পথ ও পন্থা তার কাছে ভূখণ্ডের একাংশ আর অন্য অংশের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই এবং তিনি সেই আগন্তুক, যিনি রাত্রির অন্ধকারে জমি থেকে তার যা যা প্রয়োজনীয় সব তুলে নিয়ে যান। এই বসুন্ধরা তার ভাই নয় বরং তার শত্রু তিনি একে ক্রমাগতি জয় করে অগ্রসর হয়ে চলেছেন।

তিনি ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে পেছনে ফেলে যান তার পিতার কবরভূমি। তিনি এই বসুন্ধরাকে চুরি করে নিয়ে যান, তার সন্তানদের থেকে ভুলে যান তিনি তার পিতার কবর ভূমি তার সন্তানের জন্মগত অধিকার তিনি তার মাতৃসম বসুন্ধরা অথবা ভ্রাতৃসম আকাশকে গণ্য করে পণ্যের মতো, যা ক্রয় করা যায়, লুণ্ঠন করা যায় এবং বিক্রয় করা যায় একটি ভেড়ার মতো। তিনি পরিতৃপ্তির সাথে এই বসুন্ধরাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে সর্বস্বান্ত করে দেন মরুভূমির ন্যায়। আমাদের পথ আপনাদের পথের থেকে আলাদা, তোমাদের শহরের দৃশ্য আমাদের চোখেরপক্ষে খুব পীড়াজনক। হতে পারে আমরা লাল মানুষেরা বর্বর এবং ভালো ভাবে বুঝি না এই শহরের ঐশ্বর্য।

সাদা মানুষদের শহরে একটুও কোন শান্ত পরিসর নেই। বসন্তের পাতা ঝরে পড়ার শব্দ শোনার কোনো জায়গা নেই, পতঙ্গের ডানা ঘষটানোর কোনো শব্দ নেই। হতে পারে আমি অসভ্য তাই আমি বুঝিনা, কর্কশ স্বর শুধু কানকে অপমান করে চলেছে। জীবনের কি অর্থ যদি না মানুষ শুনতে পায় হুইপোরডইলের নিঃসঙ্গ কান্না অথবা পুকুরের ধারে রাত্রিব্যাপী দাদুরী, আমি একজন লাল মানুষ ... আমি সত্যিই চালো বুঝিনা। আমরা ভালোবাসি পুকুরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা বাতাসের স্বর। বাতাসের নিজস্ব গন্ধ, দুপুরের বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া, পাইনের গন্ধ মাখা।

বাতাস আমাদের কাছে মহার্ঘ এবং পবিত্র এবং প্রত্যেকে যারা এই অনন্ত বাতাসের অংশীদার, প্রতিটি পশুপাখী, অরণ্য-উদ্ভিদ, মানুষ। সাদা মানুষ দেখতে জানে না সেই বাতাসকে যে বাতাসে তারা গ্রহণ করে তার শ্বাসবায়ু। বহুদিন ধরে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা একটা মানুষের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে তার ঘ্রাণ।

কিন্তু আমরা যদি বিক্রয় করি আমাদের ভুখন্ড তবে মনে রাখবেন আমাদের এই বাতাস পবিত্র। এই বাতাস বহন করে চলেছে সমস্ত প্রাণের যৌথ ছন্দ। যে বাতাস আমাদের পূর্ব পুরুষকে দিয়েছিল প্রথম শ্বাসবায়ু, সেই বাতাসই গ্রহণ করে তার শেষ নিঃশ্বাস।

যদি আমরা বিক্রয় করি এই ভুখন্ড তবে আপনি একে রাখবেন আলাদা ভাবে পবিত্র করে, তা হবে এমন একটি জায়গা যেখানে একজন সাদা মানুষও স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে ফুলের গন্ধ মাখা বাতাসের আমরা বিবেচনা করবো আপনার জমি ক্রয়ের প্রস্তাব। যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিই জমি বিক্রয়ের তবে শর্ত থাকবে সাদা মানুষদের এ অঞ্চলের সমস্ত পশুকে গণ্য করতে হবে ভাই-এর মতো।

আমি একজন জংলী অসভ্য মানুষ আমি অন্য কোনো ভাবে বুঝিনা। আমি দেখেছি শত সহস্র রক্তাক্ত পচনশীল মহিষ যাদের চলমান ট্রেন থেকে খেলাচ্ছলে গুলি ছুঁড়ে খুন করেছে শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা। আমি একজন অসভ্য জংলী মানুষ আমি বুঝিনা কি ভাবে ধোঁয়া উদ্গীরনকারী একটি লৌহ শকট হতে পারে মহিষের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যাকে আমরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য হত্যা করবো। পশুপাখী বিনা মানুষের অস্তিত্ব কি ? যদি সমস্ত পশুপাখী চলে যায় তবে মানুষ একটা ভয়াবহ একাকীত্বের মধ্যে ডুবে যাবে।

তাহলে অচিরেই পশুপাখিদের যা ঘটেছে মানুষেরও তাই ঘটবে। এই বিশ্বচরাচরে সমস্ত কিছুই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। আপনি আপনার সন্তানদের শেখাবেন তাদের পায়ের নীচে যে মাটি সেখানে তাদের পূর্ব পুরুষের ছাই রয়েছে যাতে তারা শ্রদ্ধা করতে শেখে এই মাটিকে। আপনি আপনার সন্তানদের শেখাবেন, যা আমি আমার সন্তানদের শিখিয়েছি এই বসুন্ধরা আমাদের মাতৃসম।

এই বসুন্ধরার যা ঘটবে তার সন্তানদেরও তাই ঘটবে। যদি মানুষ এই মৃত্তিকায় থুতু ফেলে তা আসলে তার নিজের ওপরেই বর্ষিত হবে।

আমরা জানি পৃথিবী মানুষের নয়। বরঞ্চ মানুষ পৃথিবীর সমস্ত জিনিস রক্ত সম্পর্কের বন্ধনের আবদ্ধ যেন একটি পরিবারের মতো। মানুষ এই প্রাণের জালিকা তৈরি করে না সে এই পৃথিবীর অংশ মাত্র।

আমরা সকলেই শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃসম। আমরা জানি একদিন সাদা মানুষেরা আবিষ্কার করবেন যে আমাদের সকলের ঈশ্বর একই।

আপনি হয়তো ভাবছেন একদিন দখল করবেন তাকে যেভাবে দখল করতে চান। আমাদের ভুখন্ড – কিন্তু আপনি তা পারবেন না। তিনি মানুষের ঈশ্বর, তাঁর আবেগ ভালোবাসা সমস্ত মানুষের জন্য সমান। এই বসুন্ধরা তার কাছ পবিত্র এবং এই বসুন্ধরার কোনো ক্ষতি আসলে মহান সৃষ্টি কর্তার প্রতি অপমান। এই পৃথিবী থেকে একদিন সাদা মানুষদেরও চলে যেতে হবে হয়তো অন্যান্য জনজাতিদের তুলনায় অনেক দ্রুত। একদিন নিজের বর্জ্যে দমবন্ধ হয়ে হয়তো আপনাদের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু ক্ষয়ে চলার ক্ষণেও আপনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন ঈশ্বরের মহান শক্তিতে, যিনি আপনাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন এবং বিশেষ কোনো কারণে আপনাকে দিয়েছিলেন এই ভূখন্ডের ওপরে আধিপত্য করার অধিকার।

এই ভবিতব্য আমাদের কাছে রহস্যাবৃত, কারণ আমরা বুঝিনা যখন জবাই হয়ে গেলো মহিষেরা, পোচ মানলো বুনো ঘোড়ারা, প্রচুর মানুষের ঘ্রাণে ভরে উঠলো অরণ্যের প্রতি কোন এবং উর্বর পাহাড়ের কোলে দেখা দিলো ইথার তরঙ্গ।

কোথায় সেই অরণ্য ? নেই।
কোথায় সেই ঈগল ? নেই।
শেষ হলো বেঁচে থাকা এবার টিকে থাকার শুরু।

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

ম্যালকম আদিসেশিইয়া

এরিক প্রভাকর রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

(১৯১০-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

কথায় বলে, যে যেমন, সে তেমন চোখেই পৃথিবীকে দেখে। ম্যালকম আদিসেশিইয়া ছিলেন একজন উঠতি অর্থনীতিবিদ, তাও আবার এমন সময় যখন তার দেশ ভারতবর্ষ সবে ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে বেরিয়েছে। চাহিদা-জোগান, ক্রেতা-লগ্নিকারি, লাভ-উৎপাদন-উন্নয়নের চুলচেরা বিচার করেছেন অর্থশাস্ত্রের হাত ধরে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন, দারিদ্র ঘোচানোর স্বপ্ন দেখেছেন আদিসেশিইয়া।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই যে কেবল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে দারিদ্র দূরীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এই ভাবনাও তখন থেকেই দানা বাধঁছিল তাঁর মনে। আর শিক্ষা ক্ষেত্রও যে লাভজনক বিনিয়োগের একটা উপায় সে কথাও মাথায় চাড়া দিচ্ছিল। দেশ জুড়ে শিল্পায়নকে সুস্থায়ী করতে গিয়ে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে চাষাবাদকে কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপায় করে রেখে দিলে চলবে না। এখানেও চাই বিনিয়োগ।

চাহিদা-জোগান, ক্রেতা-লগ্নিকারি, লাভ-উৎপাদন-উন্নয়নের চুলচেরা বিচার করেছেন অর্থশাস্ত্রের হাত ধরে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন, দারিদ্র ঘোচানোর স্বপ্ন দেখেছেন আদিসেশিইয়া।

শিল্প উন্নয়ন কৃষিতে উন্নতি আনবে। আর এর সব কিছুর মূলে থাকবে শিক্ষা। তত্ত্বের কচকচি নয়, হাতে কলমে শিক্ষার কারবারি ছিলেন ম্যালকম। তাই এই মাষ্টার মশাই ক্লাসঘরের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে ছাত্রদের নিয়ে গ্রামের ক্ষেত-খামারে ঘুরে ঘুরে অর্থনীতির তত্ত্বগুলো ঝালিয়ে নিতেন। হাতে পেষাই করা চাল আর হাতে বানানো কাগজ, তাঁত ফসল ফলনের আর গ্রামীণ ধার বাকির পিছনে যে অর্থনীতি কাজ করে তার মাপজোক করতেন। আর জোর গলায় প্রতিষ্ঠা করতেন এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকার কথা, যেখানে শিক্ষা এসে হাল ধরবে।

দেশ জুড়ে শিল্পায়নকে সুস্থায়ী করতে গিয়ে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে চাষাবাদকে কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপায় করে রেখে দিলে চলবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পনেরো বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ষাটটি দেশ উপনিবেশের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। আর প্রায় এই সময় ধরে– ১৯৫০-৬০, আদিসেশিইয়া জাতিপুঞ্জের সামাজিক– অর্থনীতি বিভাগ ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকেন। কাজের সূত্রে তাঁকে প্রায়ই যেতে হত সেই সব সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রগুলিতে। এই দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতার পটভূমিকায় ছেয়ে ছিল গভীর দারিদ্র, সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্যতা, শিল্পায়নে অনভিজ্ঞতা। তার সাথে ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, যা আদতে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের ভালো থাকার সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসকের চাহিদা চরিতার্থ করাই ছিল এই শিক্ষার লক্ষ্য। আদিসেশিইয়া মতে শিক্ষার উপর নির্ভর করে সমাজ পরিবর্তন আর প্রযুক্তি গত প্রগতি। সমাজের চলমান সামাজিক অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষার মিলন সাধন করবে শিক্ষা। চাকরির বাজারের বাজারের প্রতিযোগী তৈরি করার সাথে শিক্ষা আবার ধরে রাখবে, বয়ে নিয়ে চলবে দেশজ সংস্কৃতি এবং তার ঐতিহ্য।

প্রতিফলিত করবে সমাজের মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন। তাঁর মতে শিক্ষা হল এক ধরণের উদ্যোগ যার লক্ষ্য আছে, আছে উদ্দেশ্য। কী পড়ানো-শেখনো হবে তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করার সময় সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক-রাজনৈতিক চাহিদা বুঝে নিতে হবে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার নিজস্ব চাহিদা – অবস্থান অনুসারে শিক্ষাকে হতে হবে বাস্তবমুখি ও সুসঙ্গত। ইউনেস্কোর প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিভাগের নির্দেশক হিসাবে আদিসেশিইয়াকে ঘুরে বেড়াতে হত নানা দেশে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের দৌড় তার নজরে আসত। আর এখানেই তিনি তাঁর বিশ্বাস কাজে লাগাতেন। যেহেতু শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে তাই তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলোর শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, সেই সব নেতা, মন্ত্রীদের সাথে গিয়ে কথা বলতেন। প্রথমেই তিনি এই সব দেশের নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে, উন্নয়নকে ঘিরে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে উপলব্ধি সঞ্চারিত করতেন। এর পরের কাজ দেশগুলিকে তাদের নিজ নিজ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে সাহায্য করতেন।

এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে মাথায় রেখে স্থির করা হত। এর পরের ধাপে রাষ্ট্রগুলিকে যথাযথ শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য

সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হত, যাতে স্বল্প খরচে সর্বোচ্চ লাভ অর্জন করা সম্ভব হয়। জাতীয় পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত কাজ হল শিক্ষা সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা অবস্থান নির্দিষ্ট করে ফেলা। ১৯৬০ এর দশক জুড়ে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় আদিসেশিইয়ার অর্থনৈতিক পরামর্শ প্রামাণ্য মনে করত। তাঁর উৎসাহে উন্নয়নশীল দেশগুলি জাতীয় পরিকল্পনার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আঞ্চলিক স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনার ছক তৈরি করার সাহস পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে করাচীতে প্রথম এশিয়া মহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরি হয়।

এবং তার পরে পরেই এই অঞ্চল ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আফ্রিকায়, আরব দেশে, লাতিন আমেরিকায়। ধীরে ধীরে ইউনেস্কোর প্রযুক্তিগত সহায়তা বিভাগটি জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্পে (ইউ এন ডি পি) তে পরিণত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য পরিকল্পনা মাফিক সহায়তা আরো সংগঠিত হয়ে ওঠে। আদিসেশিইয়ার উৎসাহে এই বিভাগের সিংহভাগ অর্থ শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ হতে শুরু করে।

১৯৫৯ সালে করাচীতে প্রথম এশিয়া মহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরি হয়। এবং তার পরে পরেই এই অঞ্চল ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আফ্রিকায়, আরব দেশে, লাতিন আমেরিকায়।

শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে আদিসেশিইয়াকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হত। করতে হয়েছে প্রচুর লেখালেখি। ইউনেস্কোর অফিস ঘরের টেবিলে বসে চলত তাঁর গবেষণা। ইউনেস্কোর বর্ষপঞ্জী ঘেঁটে ঘেঁটে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মাথা পিছু বৃদ্ধি হারের সঙ্গে স্কুল-ভর্তি আর শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনামূলক তালিকা তৈরি করতেন।

অন্যদের লেখা গবেষণা পত্রগুলো পড়ে বের করে আনতেন তাদের সারমর্ম। শিক্ষার ফলে, স্কুল-কলেজে বিনিয়োগের ফলে, বয়স্ক শিক্ষা – সাক্ষরতা আর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে ফলে ব্যক্তির উতপাদনশীলতা বাড়ে, কারবারের লাভ বৃদ্ধি পায়। প্রথাগত ও প্রথাবিহীন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সঙ্গে সুস্থায়ী উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্কের পক্ষে প্রমাণ জোগাড়ে ব্যস্ত থাকতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর দাবির স্বপক্ষে আওয়াজ তুলতেন। আর তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় ২০ বছর পর ১৯৬২ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে।

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় ২০ বছর পর ১৯৬২ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আদিসেশিইয়া জোরের সাথে ঘোষণা করতেন উন্নয়নের মানবিক দিকটা উপেক্ষা করলে সেই উন্নয়ন কোনদিনও সুস্থায়ী হবে না। আর সুস্থায়ী উন্নয়নের পরিকাঠামো নির্ভর করে শিক্ষার উপর। শিক্ষা কেবল ব্যক্তির বৃত্তিমূলক প্রস্তুতির পণ্য নয় জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হল শিক্ষা। শিক্ষা হল দেশের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুঁজির লগ্নি। দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে নানান মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে নানান জটিলতা আর অসাম্য দেখে শিক্ষার মনমোহিনী জাদুর কথাই মনে করেছেন আদিসেশিইয়া।

অশিক্ষিতের সামনে শিক্ষা পারবে অভিজ্ঞতার দুনিয়া খুলে দিতে। তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন। দারিদ্রতাকে অমোঘ ভাগ্য বলে আর মেনে নেবেন না। তাঁরা সচেষ্ট হবেন পরিস্থিতিকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে।

নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে নতুন নতুন দক্ষতায় শিক্ষিত হবেন, নিজেদের স্বাস্থ্য পরিবারের স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন, নিজেদের জীবন ধারণ প্রক্রিয়ায় বদল আনবেন, যাতে তাঁরা প্রগতিশীল দেশের সক্ষম নাগরিক হয়ে উঠতে পারেন। আদিসেশিইয়ার শিক্ষাচিন্তা, তাই আশ্বাসের কথা বলে, আত্মবিশ্বাসের কথা বলে। ভারতের গ্রামগঞ্জগুলি মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ।

তাঁদের মন প্রাণ সহজাত জ্ঞানে ভরপুর। তাঁদের এই বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত পড়ে আছে। তার কারণ ভয়ঙ্কর নিরক্ষতা কৃষি পণ্য উতপাদনে বিস্তার আনতে প্রয়োজন স্বাস্থ্য আর শিক্ষায় উন্নতি। গ্রামের মানুষের আর দেশের কৃষকশ্রেণীর জীবিকার উন্নয়নে প্রয়োজন বয়স্ক শিক্ষার প্রসার।

প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে লক্ষ্যে আদিসেশিইয়া অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছেন। জীবনের ২৫ বছর প্রকৃত অর্থে বিশ্ব নাগরিক হিসাবে কাটালেও জীবনের শেষ দিনগুলো গ্রামীণ ভারতের সমস্যা সমাধানেই কেটেছে। তাঁর তৈরি করা মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আর্থ সামাজিক নানা বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় তাঁরই নেতৃত্বে। জীবনান্তে তাঁর সব দিয়ে যান এই সংস্থাকে।

জীবণ যাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব এখানেই
আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

লালন

সেপ্টেম্বর ১৭৭৪
অক্টোবর ১৭, ১৮৯০

কুষ্টিয়া শহরের অদূরে একটি ছায়াঘেরা নিবিড় গ্রাম ছেঁউড়িয়া। এক পাশে শান্ত নদী গড়াই, অন্য পাশে কালিগঙ্গা নদী। এখানেই বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের সমাধি। এই মাজারকে ঘিরে প্রতি বছর বসছে লালন মেলা। প্রতি বছর দুটি অনুষ্ঠানে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশ থেকেও আসেন লালন ভক্তরা। বাউল-ফকিরদের কণ্ঠে সুরের মূর্ছনা তৈরি করে লালনের গান। লাখো ভক্তের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় সিক্ত হয় লালন আখড়া।

এখন থেকে প্রায় ২১৯ বছর আগে একদিন ভোর বেলায় ষোল-সতের বছর বয়সের অচেতন অবস্থায় কিশোর লালন ভাসতে ভাসতে কালিগঙ্গা নদীর তীরে আসেন। ওই দিন ভোরবেলা মাওলানা মলম শাহ ফজরের নামাজ পড়ে কালিগঙ্গা নদীর দিকে সকালের মৃদু বাতাসে শরীর জুড়ানোর জন্য গিয়েছিলেন। হঠাত্ই দেখতে পেলেন এক অচেনা সংজ্ঞাহীন কিশোর অর্ধজলমগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে, ছেলেটির মুখে ও শরীরে বসন্ত রোগের দাগ। তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন ছেলেটি বেঁচে আছে, খুব ধীরলয়ে চলছে শ্বাস-প্রশ্বাস। নিঃসন্তান হাফেজ মলমের বুকের ভেতর হু হু করে উঠল, এ কোনো অচেনা যুবক নয়; আল্লাহ যেন তার সন্তানকেই ভাসিয়ে এনেছেন তাঁর কাছে। মলম শাহ তখনই বাড়ি ফিরলেন এবং তার অপর তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। এবার চার ভাইয়ে ধরাধরি করে অচেনা যুবককে নিজের বাড়িতে আনলেন। মলম শাহ ও মতিজান দিনরাত সেবাযত্ন করতে লাগলেন। দিন দিন অচেনা যুবকটির মুখে জীবনের আলো ফিরে এলো। মতিজান জিজ্ঞাসা করল, বাবা তোমার নাম কী?ফকির লালন।

২১৯ বছর আগে একদিন ভোর বেলায় ষোল-সতের বছর বয়সের অচেতন অবস্থায় কিশোর লালন ভাসতে ভাসতে কালিগঙ্গা নদীর তীরে আসেন।

আমৃত্যু ফকির লালন ছেঁউড়িয়াতেই ছিলেন, মৃত্যুর পর ছেঁউড়িয়ার আখড়া বাড়িতেই তাঁর সমাধি নির্মিত হয়। ছেঁউড়িয়া ভিত্তিক লালনের জীবন-বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে খুঁজে পাওয়া যায় ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ সম্পাদিত 'লালন সঙ্গীত' নামক গ্রন্থে। লালন কোথায় ছিল, কীভাবে কালিগঙ্গা দিয়ে ভেসে এলো—এসব বিষয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। কথিত আছে, গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে লালন বসন্ত রোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। রোগের প্রকোপে অচেতন হয়ে পড়লে সঙ্গী-সাথীরা তাকে মৃত মনে করে রোগ সংক্রমণের ভয়ে তাড়াতাড়ি নদীতে ফেলে দেয়।

লালনের জন্ম আসলে কোথায় তা আজও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কোন কোন লালন গবেষক মনে করেন, লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মেছিলেন।' কিন্তু তার জাতিত্ব পরিচয় রহস্যাবৃত।'আসলে লালন নিজেও তার জন্ম পরিচয় দিতে উৎসাহবোধ করেননি, তা তার গানেই স্পষ্ট—

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/ লালন কয় জাতের কি রূপ/ দেখলাম না এই নজরে।' সত্যিই তাই, জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে লালন নিজেকে শুধুই মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে গেছেন।

লালন হিন্দু কী মুসলমান, এ নিয়েও বিস্তর মতামত পাওয়া যায়। কারও মতে, লালন কায়স্থ পরিবারের সন্তান যার পিতা মাধব এবং মাতা পদ্মাবতী; পরে লালন ধর্মান্তরিত হন। গবেষকদের মতে, বেশিরভাগই মনে করেন লালন মুসলিম তন্তুবায়ী পরিবারের সন্তান। লালন ফকির নিজের জাত-পরিচয় দিয়ে গিয়ে বলেছেন—'সব লোকে কয় লালন কি জাত এ সংসারে'

রোগমুক্তির কিছুদিন পর লালন ফকির বিদায় চাইলেন, বললেন—'আমি সংসারত্যাগী মানুষ; এই ভবসংসারে আমার ঠাঁই নেই।' কথিত আছে, লালন অলৌকিকভাবে হেঁটে ওই সময়কার প্রমত্তা কালিগঙ্গা পার হয়ে যান। পরে অবশ্য মলম শাহ ডিঙি নৌকা নিয়ে পার হয়ে প্রায় দৌড়ে গিয়ে লালনকে ধরে ফেলেন এবং ছেঁউড়িয়া ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যথিত হৃদয়ে অনুরোধ করেন। লালন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, 'যেতে পারি তবে আমার জন্য আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে।' নিঃসন্তান মলম শাহ তাঁর প্রিয় সন্তানের কথা রাখলেন। কালিগঙ্গা নদীর তীরে শ্যামল বৃক্ষমণ্ডিত মলমের বাগানে তৈরি হলো চৌচালা ঘর আর আখড়া বাড়ি। চৌচালা ঘরটি লালন সাধনকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতেন। কালের নিয়মে ছনের ঘরটি বিলীন হয়ে গেলেও মহান সাধক লালনের পরশমাখা সাধনকক্ষের কপাটজোড়া এবং জলচৌকি এখনও লালন একাডেমির জাদুঘরে রাখা আছে। এই আখড়া বাড়িটিই ক্রমে লালন সাধনার পুণ্যধামে পরিণত হয়। ফজরের নামাজের

লালন ফকির নিজের জাত-পরিচয় দিয়ে গিয়ে বলেছেন—'সব লোকে কয় লালন কি জাতএ সংসারে'

পর মাওলানা মলম শাহ কোরআন তেলাওয়াত করতেন, ফকির লালন মনোযোগ দিয়ে তেলাওয়াত শুনতেন, মানে জিজ্ঞাসা করতেন। লালন কোরআনের কিছু কিছু আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করতেন, ব্যাখ্যা শুনে মাওলানা মলম অভিভূত হয়ে যেতেন।

লালনের প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও অনুপ্রাণিত হয়ে এক সময় মলম শাহ ও মতিজান লালনের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মলম কারিকর থেকে হয়ে যান মলম শাহ, অন্যদিকে মতিজান হয়ে যান মতিজান ফকিরানী। ফকির মলম শাহ ছিলেন লালনের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্য। মলমের অপর দুই ভাই কলম ও তিলম সস্ত্রীক পর্যায়ক্রমে লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

লালনের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, তার হাত দুটো এত লম্বা ছিল যে দাঁড়ালে আঙুলগুলো হাঁটুর নিচে পড়ত। উঁচু নাক, উন্নত কপাল আর গৌরবর্ণের লালনের ছিল গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ। কাঁধ বরাবর চুল, লম্বা দাড়ি, হাতে ছড়ি, পায়ে খড়ম, গায়ে খেলকা, পাগড়ি, আঁচলা সব মিলিয়ে লালন যেন বকে সিদ্ধপুরুষ, পরিপূর্ণ সাধক।

তার মনে নতুন গান উদয় হলে তিনি শিষ্যদের ডেকে বলতেন, ‘পোনা মাছের ঝাঁক এসেছে।’ লালন গেয়ে শোনাতেন, ফকির মানিক ও মনিরুদ্দিন শাহ সেই বাঁধা গান লিখে নিতেন।

লালন মুখে মুখেই গানের পদ রচনা করতেন। তার মনে নতুন গান উদয় হলে তিনি শিষ্যদের ডেকে বলতেন, ‘পোনা মাছের ঝাঁক এসেছে।’ লালন গেয়ে শোনাতেন, ফকির মানিক ও মনিরুদ্দিন শাহ সেই বাঁধা গান লিখে নিতেন। লালনের জীবদ্দশাতেই তার গান বহুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ফকির মানিক শাহ সেই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। লালনের শিষ্যদের ধারণা, তার গানের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এত বিপুলসংখ্যক গান পাওয়া যায় না। শোনা যায়, লালনের কোনো কোনো শিষ্যের মৃত্যুর পর গানের খাতা তাদের কবরে পুঁতে দেয়া হয়। এছাড়াও অনেক ভক্ত গানের খাতা নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেননি।

ছেঁউড়িয়ায় কয়েক বছর থাকার পর লালন তার শিষ্যদের ডেকে বললেন, আমি কয়েক দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, তোমরা আমার সাধনকক্ষটার দেখাশোনা করো। সপ্তাহ তিনেক পর তিনি একটি অল্পবয়স্কা সুশ্রী যুবতীকে নিয়ে ফিরলেন। মতিজান ফকিরানী জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটা কে বাবা? লালন জানান, তোমাদের গুরু মা। একথা শোনার পর আখড়া বাড়ির সবাই গুরু মাকে ভক্তি করলেন। বিশখা নামের এই মেয়েটি সারাজীবন লালনের সঙ্গে ছিলেন। লালনের মৃত্যুর ৩ মাস পর তিনি মারা যান। বিশখা ফকিরানী প্রায় একশ’ বছর ধরে ছেঁউড়িয়ায় ছিলেন, কিন্তু তার প্রকৃত নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এমনকি মৃত্যুর পরও তার কোনো আত্মীয় বা পরিচিত জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অচিন মানুষ ফকির লালনের মতোই বিশখা ফকিরানী আজও এক অচিন নারী।

প্রকৃত সাধুদের তো মুখ পোড়ার কথা নয়! লালন এক কোনায় বসে ছিলেন, যুবকদের এই কথা শুনে বলল—‘তোমরা কী চাও?’ তোমরা কেমন সাধু হয়েছো তা দেখতে চাই।

ফকির লালন একদিন তার সাধনঘরে একা একা বসে ছিলেন। এমন সময় খোকসা থানার কমলাপুর গ্রামের দুজন ভক্ত এসে জানালেন যে তাদের গ্রামে কলেরা লেগেছে, সেখানকার ভক্ত ফকির রহিম শাহ তার নাবালক ছেলে এবং স্ত্রীকে রেখে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। সব শুনে লালন খুব মর্মাহত হলেন। ফকির রহিম শাহের নাবালক ছেলে শীতলকে নিজের কাছে আনলেন। বিশখা ও লালন তাকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। অন্যদিকে বেশ কয়েক বছর পর ফকির শুকুর শাহ তার মাতৃহারা মেয়েকে লালনের কাছে নিয়ে আসেন, লালন সস্নেহে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বিশখাকে বললেন, আজ থেকে এই শিশুটিও তোমার মেয়ে। পরীর মতো সুন্দর এই মেয়েটিকে লালন পরী না বলে ‘প্যারিনেছা’ বলে ডাকতেন। ভোলাই শাহ লালনের একান্ত শিষ্যদের অন্যতম, বাল্যকাল থেকেই তিনি আর শীতল একই ঘরে থাকতেন। ভোলাই শাহ বড় হয়ে কোনো এক দোল পূর্ণিমার রাতে প্যারীনেছার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

ফকির লালনকে নিয়ে বেশকিছু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। একবার লালন তার শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গা নদী পার হয়ে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধামে পৌঁছলেন। মন্দিরের লোকজন আগন্তুকদের বেশভূষা দেখে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। লালন শিষ্য শীতল শাহ বললেন, আমরা কুষ্টিয়া থেকে এসেছি, সবাই ফকির মতবাদের সাধক। তখন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বলা হলো, কুষ্টিয়া থেকে কিছুসংখ্যক ফকির এসেছে যাদের বেশিরভাগ মুসলমান। মহা প্রভু সব শুনে তাদের বসার ব্যবস্থা করতে বললেন। আঙ্গিনার এক পাশে বড় নিমগাছের তলায় তাদের জায়গা করে দেয়া হলো। সারা রাতের অনুষ্ঠান শেষে সাধুগুরু এবং বোষ্টমীদের সেবা দেয়ার পর যুবকরা পিতলের থালায় করে সোয়া সের চুন নিয়ে এলো এবং সবাইকে বলা হলো পাতুন, মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করুন। চুনে মুখ পুড়ে যাবে এই ভয়ে শিষ্যরা কেউ হাত পাতল না। বরং একযোগে ক্ষমা চাইল। যুবকরা বলল আপনারা কেমন সাধু! চুনে মুখ পুড়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ হাত পাতলেন না। প্রকৃত সাধুদের তো মুখ পোড়ার কথা নয়! লালন এক কোনায় বসে ছিলেন, যুবকদের এই কথা শুনে বলল—‘তোমরা কী চাও?’ তোমরা কেমন সাধু হয়েছো তা দেখতে চাই।

লালন যুবকদের কলার পাতা এবং একটি চাড়ি আনতে বলল। অতঃপর তিনি খানিক চুন কলার পাতায় রেখে বাকি চুন চাড়িভর্তি পানিতে গুলিয়ে দিলেন। এবার তিনি নিজেই কলার পাতার চুনগুলো খেয়ে ফেললেন এবং শিষ্যদের চাড়ি থেকে গ্লাসে করে চুনগোলানো শরবত খাওয়ালেন। তারা সবাই শরবত পানের তৃপ্তি লাভ করল। এই শরবত পান চুন সেবা

নামে পরিচিত। লালন ঘোড়ায় চড়তেন, মাঝে মাঝে গভীর রাতে চাঁদের আলোয় ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন, কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন তা তার শিষ্যরা কেউ বলতে পারত না।

লালন একাডেমির খাদেমকে লালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, আমার দাদাগুরু ভোলাই শাহের কাছে শুনেছি, লালন রাতের বেলায় দুধ দিয়ে খই ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য খেতেন না। প্রায় সারা রাত জিকির-আজকার ও ইবাদত করতেন, একটু পরপর পান খেতেন। তখন আখড়া বাড়িতে পানের বরজ এবং অনেক ঝোপজঙ্গল ছিল। ভক্তরা ভারতের গোয়া থেকে ফকির লালনের জন্য চুন নিয়ে আসত, সেই চুনে তিনি পান খেতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, নবদ্বীপ থেকে এখনও কিছু লালনভক্ত আখড়ায় আসে। তাদের কাছে সে শুনেছে, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধামে লালন ও তার শিষ্যদের যে চুনসেবা দেয়া হয়েছিল সেই চুনসেবায় লালনের যে আসন পাতা ছিল তা এখনও সংরক্ষিত আছে। খাদেমের ধারণা, হয়তো দোল পূর্ণিমার তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই লালন তার জীবদ্দশায় ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার রাতে খোলা মাঠে শিষ্যদের নিয়ে সারা রাত গান-বাজনা করতেন। ধারাবাহিকতায় এখনও লালন একাডেমি প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার রাতে তিন দিনব্যাপী লালন স্মরণোৎসবের আয়োজন করে থাকে। লালন চত্বর ছাড়াও আখড়ার অভ্যন্তরভাগসহ সর্বত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা হাজার হাজার বাউল ছোট ছোট দলে সারা রাত গান করে। এছাড়াও প্রতি বছর ১ কার্তিক লালনের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার বাউল যোগ দেয় ওই উৎসবে, দোল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বাউলরা আকাশের দিকে হাত তুলে গান ধরে... 'এলাহি আল আমিনগো আল্লাহ বাদশা আলমপানা তুমি/ ডুবাইয়ে ভাসাইতে পারো, ভাসাইয়ে কিনার দাও কারো/ রাখো মারো হাত তোমার, তাইতে তোমায় ডাকি আমি।'

খাদেমের ধারণা, হয়তো দোল পূর্ণিমার তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই লালন তার জীবদ্দশায় ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার রাতে খোলা মাঠে শিষ্যদের নিয়ে সারা রাত গান-বাজনা করতেন।

লালনের দর্শন মূলত প্রেমের দর্শন এ দর্শন মতে শস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষ বড়। "মানুষেই আছে মানুষ রতন, আলেক সাঁই। প্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। প্রেমই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

লালন ফকিরের বয়স তখন ১১৬ বছর, একদিন তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, এই আশ্বিন মাসের শেষের দিকে তোমরা কোথাও যেও না কারণ পহেলা কার্তিকে গজব হবে। গজবের বিষয়টি শিষ্যরা কেউ সঠিকভাবে অনুমান করতে না পারলেও আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করতে লাগল। মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে তার পেটের ব্যারাম হয়, হাত-পায়ের গ্রন্থিতে পানি জমে। পীড়িতকালেও তিনি আল্লাহর নাম সাধন করতেন, মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হতেন। ধর্মের আলাপ পেলে নববলে বলীয়ান হয়ে রোগের যাতনা ভুলে যেতেন। এসময় দুধ ভিন্ন অন্য কিছু খেতেন না, তবে ইলিশ মাছ খেতে চাইলে শিষ্যরা বাজার থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে আসে। দুপুরে সাধন ঘরের সামনে সামিয়ানা টানিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। বিকাল থেকে শুরু করে সারা রাত লালন তার শিষ্যদের শাশ্বত বাণী শোনান, মাঝে মাঝে গাওয়া হয় তার গান। রাতে আলোচনা শেষ করে লালন সাধন ঘরে ফিরে গেলেন বিশ্রাম নিতে। শিষ্যদের বললেন, আমি চললাম। লালন চাদর মুড়ি দিয়ে বিশ্রাম নিলেন, শিষ্যরা মেঝেতে বসে থাকলেন। এক সময় লালন কপালের চাদর সরিয়ে বললেন, তোমাদের আমি শেষ গান শোনাব। লালন গান ধরলেন, গভীর অপরূপ সুন্দর গান—'পার কর হে দয়াল চাঁদ আমারে/ক্ষম হে অপরাধ আমার/এই ভব কারাগারে।'

গান শেষ হলো, চাদর মুড়ি দিয়ে চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেলেন ফকির লালন। ফকির লালনের জন্মসাল জানা যায়নি, তিনি ১ কার্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৭ অক্টোবর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তিনি বেঁচে ছিলেন ১১৬ বছর। সে হিসেবে তিনি জন্মেছিলেন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ছেঁউড়িয়াতে ফকির লালনের সঙ্গে তার পালিত মা মতিজান ফকিরানী, পালিত বাবা মলম শাহ, ফকির মণ্ডিত মানিক শাহ, শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, বিশখা ফকিরানী এবং ফকির মনিরুদ্দিন শাহসহ অন্য আরও অনেক ভাবশিষ্যের সমাধি আছে। প্রতি বছর ১লা কার্তিক এখানে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার বাউল সমবেত হয়ে উদযাপন করেন তার মৃত্যুবার্ষিকী। সেই থেকে বছরের দুই সময়ে লালন আখড়ায় বসে ভক্তদের মেলা। লাখো ভক্তের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় সিক্ত হয় লালনের সেই বসতভিটা।

বয়স তখন ১১৬ বছর, একদিন তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, এই আশ্বিন মাসের শেষের দিকে তোমরা কোথাও যেও না কারণ পহেলা কার্তিকে গজব হবে।

" ছিলাম কোথায় এলাম হেথায়,
আবার আমি যাই যেন কথায়,
তুমি মনোরথের সারথি হয়ে
স্বদেশে লও মনেরি।

প্রকৃত সভ্যতা হল তাই, যেখানে মানুষ মানুষ সকলকে নিয়ে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই সময়

প্রায় দেড়শ বছর আগে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থটি লিখেছিলেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট ২০ টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তে তৎকালীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও জেলার ভৌগলিক বিবরণ সহ সেখানকার অধিবাসীদের জীবন জীবিকা ও তাদের আর্থ সামাজিক চিত্র নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যেভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন বাংলার জেলা ভিত্তিক যে পরিচয় আমরা পাই – তা আজও প্রাসঙ্গিক ।আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার সেই পুরনো দিনগুলির দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি । এখন দেখা যাক কেমন ছিল সেই সময়।

সুন্দরবন

গাঙ্গেয় এলাকার সবচেয়ে দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চল। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসেব অনুসারে সুন্দরবনের আয়তন ছিল ৫৫৭০ বর্গ মাইল এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সুন্দরবনের কমিশনারের হিসেব অনুযায়ী সুন্দরবনের আয়তন ছিল ৭৫৩২.৫ বর্গ মাইল। কিন্তু তৎকালীন সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথকভাবে সুন্দরবনের জনসংখ্যার হিসেব পাওয়া যায়না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সুন্দরবন অঞ্চলটি তৎকালীন ২৪ পরগণা, যশোর এবং বাকেরগঞ্জের বিস্তৃত অংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই ভাবে তৎকালীন তিনটি জেলায় বিস্তৃত হওয়ার ফলে সুন্দরবন অঞ্চল হিসেবে সেখানকার জন্য পৃথক কোনও নিজস্ব রাজস্ব ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি।

তৎকালীন সুন্দরবন অঞ্চলটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে জঙ্গল এবং বিভিন্ন নদ নদী, খাঁড়ি ও মোহনার দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও তা ছিল গাঙ্গেয় এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেই সঙ্গে ছিল বিভিন্ন আকার ও আয়তনের বিভিন্নরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্বীপ অঞ্চল। তৎকালীন সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ যোগ্য জমি ছিল একমাত্র উত্তরপ্রান্তে। তৎকালীন যশোর জেলার রিপোর্ট লিখতে গিয়ে মিঃ ওয়েস্টল্যান্ড উল্লেখ করেন যে যশোর জেলার সংলগ্ন সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু বাড়ি ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের কিছু চাষযোগ্য জমিও ছিল, কিন্তু তা ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, সেরকম কিছু ছিল না। যারা চাষ করত(মূলত ধান চাষ হত) তারা নিজের নিজের জমির সংলগ্ন এলাকাতেই বাস করত।

হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী তৎকালীন সুন্দরবন অঞ্চলের বিশিষ্ট নদীগুলি হল – হুগলী, সাত্তারমুখি, জামিরা, মাতলা, বঙ্গাদুনি, গোসাবা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, বড় পাঙ্গা, মারজাতা অথবা কাগা, বঙ্গারা, রমনাবাদ চ্যানেল, মেঘনা প্রভৃতি। অন্যান্য আরও কয়েকটি নদী হল – পাসার, বিশখালি, ঠাকুরান, কাবাদক, হাড়িয়া ভাঙ্গা, খোল পেটুয়া, ইছামতী, ভোলা, বুড়িশ্বর, আঁধার মানিক, বাহাদুর প্রভৃতি। নদীগুলিতে সারা বছর ধরেই নৌকা চলাচল করত। নৌকাগুলি এমন ছিল, যেগুলিতে প্রায় চার টন ওজনের মালপত্র বহন করা যেত। সুন্দরবন অঞ্চলে ছোট ছোট নদী এবং ঝর্ণা ছিল অসংখ্য। সমস্ত নদীতেই যে দিকে জলের স্রোত বেশি আঘাত করত, নদীর সেই ধারগুলি ভেঙ্গে পড়ত এবং নদীর বিপরীত পাড় গুলি ঢালু হয়ে নেমে আসত নদীর জলের কাছাকাছি। নদীর পাড় গুলিতে ছিল পরিপূর্ণ জঙ্গল এবং তা উঁচু ডাঙ্গা থেকে নদীর জলের স্রোত পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এসময় কোনও হ্রদ বা ক্যানালের অস্তিত্ব সুন্দরবনে পাওয়া যায়নি। এসময় সুন্দরবন অঞ্চলে জলে ডুবে কোনও মানুষের মৃত্যুর খবরও জানা যায়নি। তবে এটা জানতে পারা যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষরা প্রত্যেকেই সাঁতার জানত এবং সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায়ই ঝড়ের আঘাত নেমে আসত, আর তাতে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসত বিপর্যয়। ১৮৬৪, ১৮৬৭ এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবন এলাকায় যে সাইক্লোন হয় তাতে এলাকার অধিবাসীদের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির কথা জানা যায়। উত্তরের জেলাগুলি থেকে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে যে নৌকাপথ চালু ছিল, সেগুলি এখনও একই আছে, একশত বছর আগেও তা একই রকম ছিল। কলকাতা, ঢাকা ও আসাম যাতায়াতের জন্য সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে একটি স্টিমার রুটও চালু ছিল।

সুন্দরবন অঞ্চলে নদী তীরে কোনও শহর ছিল না। কিন্তু নদীর তীরগুলিতে কোথাও কোথাও ব্যবসাবাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কিছু গ্রাম বা জনবসতি গড়ে উঠেছিল। সেই সব ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে মূলত ধান, চাল বিক্রি হত এবং তা বিক্রি করে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের ঘর গেরস্থালির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করত। এই সব ব্যবসাকেন্দ্রগুলি ছিল ২৪ পরগণার উত্তর সীমায় সুন্দরবন এলাকার বসরা এবং বসন্তপুরে, যশোরের সুন্দরবন এলাকার চাঁদখালি, মোরেল গঞ্জ এবং খুলনাতে। যেমন চাঁদখালিতে সপ্তাহে একদিন যে হাট বসত, সেটা ছিল সোমবার। এই সোমবার ছাড়া অন্যান্য দিনগুলিতে হাটের স্থানগুলি থাকত নির্জন ও নিস্তব্ধ। চাঁদখালি ছাড়া অন্যান্য স্থানে যেখানে যেখানে রবিবারে কুটিরশিল্প বা হস্তশিল্পের বাজার বসত, সেখানে সংলগ্ন জেলাগুলি থেকেও বিভিন্ন মানুষের সমাগম ঘটত।

যমুনা এবং বালেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী সুন্দরবন অঞ্চলে নদীর ছাপিয়ে যাওয়া জল চাষের কাজে ব্যবহার করা হত। তাছাড়া যে পরিমাণ বৃষ্টি হত, তাও চাষের কাজে যথেষ্ট ছিল। আর সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে মাছ ধরার অধিকার সবাই ভোগ করত। এজন্য তৎকালীন প্রশাসনের কাছে কাউকে কোনও রাজস্ব বা কর দিতে হত না। কিন্তু ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সরকারের পক্ষে ফিশারিজের অধিকার সংক্রান্ত একটি অকশন পেশ করা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে সে সময় যেসব মাছ পাওয়া যেত, সেই সব মাছগুলি হল – ভেটকি, ভোলা, শোল, বাঁশপাতা, মাগুর, পার্শে, ট্যাংরা, পাঙাশ, চিংড়ি, মোচা চিংড়ি, চুনা, ইলিশ, পায়রা চাঁদা, পাটকা, পোয়া, সিঙ্গি এবং পুঁটি প্রভৃতি। আর যেসব মাছ মাঝে মধ্যে পাওয়া যেত, সেগুলি হল – রুই, কাতলা, চ্যালা, মৃগেল, কোকিলা, তপসে, কালবোস, বোয়াল প্রভৃতি। নদী গুলিতে প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়া ও কচ্ছপও পাওয়া যেত। তবে মাছ ধরা, নৌকা চালনা বা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মানুষের শতকরা হার বা অনুপাত কত ছিল তা জানা যায়না। কিন্তু এটা জানা যায় যে চাষবাস, নৌকা চালনা ও মাছ ধরার পেশা ছাড়াও কাঠ কাটা ও কাঠ সংগ্রহ করার পেশাতেও বহু মানুষ যুক্ত ছিল। বিশেষত তখন জ্বালানী কাঠের ব্যবসাই ছিল প্রধান। কাঠ কাটা ও কাঠ সংগ্রহ করার কাজে যেসব সম্প্রদায়ের মানুষরা যুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। তারপরেই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের স্থান। এই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা ছিল বাগদি, তিওর, চণ্ডাল, কৈবর্ত এবং কাপালি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তৎকালীন সুন্দরবনের কমিশনার এবং ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্ট (বেঙ্গল) এর তথ্য অনুযায়ী সেই সময় সুন্দরবন অঞ্চলে তিরিশ ধরণের গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই তিরিশ ধরণের গাছগুলি হল – আমুর, বাইন, বলাই, ভাইলা, ভারা, বন জাম, ছাইলা, ডাবুর, ডাল করমচা, ডিমাল, গরান, গেওয়া, হেতাল, ঝাউ, জিন, কাঁকরা, কড়াই, কেকটি, কেওড়া, খালসি, কিরপা, লোহা কায়েরা, পাঙ্খেলি, পরশ, পাসুর, সিঙড়া, সিঞ্জ, সণ্ডাল, সুন্দরী, উরিয়া প্রভৃতি। তবে উপরোক্ত সমস্ত গাছ ২৪ পরগণা জেলায় পাওয়া যায় না। কিছু কিছু গাছ যশোর এবং বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবন এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। আর সুন্দরবন অঞ্চলে যে কাঠের ব্যবসার কথা জানা যায়, তার মূল কেন্দ্র ছিল চাঁদখালি। সেখান থেকে নৌকা ভর্তি করে কাঠ আমদানি করা হত কলকাতায়। কলকাতা এবং ২৪ পরগণায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে কাঠ রপ্তানি করা হয়েছিল ৩০৩,০৫০ টন। কিন্তু যশোর এবং বাকেরগঞ্জে সুন্দরবন থেকে কত পরিমাণ কাঠ রপ্তানি করা হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুন্দরবন অঞ্চলে সমস্ত কাঠুরেই দৈব শক্তি বা অরণ্যের অপদেবতার প্রতি বিশ্বাস করত। তাই কোনও ফকির বা সন্ন্যাসী ছাড়া তারা জঙ্গলে প্রবেশ করত না। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করার পর তারা পূজা অর্চনা ইত্যাদিও করত। কাঠুরেদের এই বিশ্বাস ছিল যে এই পূজা অর্চনা করার ফলে তারা কোনরকম অপ দেবতা বা বাঘ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাবে। তাই কাঠুরেরা কাঠ কেটে যে পরিমাণ আয় করত, তার একটা অংশ ফকিরকে ভাগ হিসেবে দিত। শুধু কাঠ নয়, সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ এবং ঘরের ছাউনির জন্য গাছের পাতা সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজেও বহু মানুষ যুক্ত ছিল।

সুন্দরবনে মূলত বাঘ, চিতা, গণ্ডার, বুনো মহিষ, বুনো শুয়োর, বন বিড়াল, বড় সিংহ বা বড় হরিণ, বানর প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারই ছিল প্রধান। মূলত বাঘের ভয়েই সুন্দরবন অঞ্চলে চাষের এলাকা বৃদ্ধি সম্ভব হত না বলেও জানা যায়। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র সুন্দরবনে একটি মানুষখেকো বাঘের কথা জানা যায়। কোবরা অথবা গোখরো, শঙ্খচূড়, গোসাপ এবং সবুজ ভাইপার প্রভৃতি সাপও সুন্দরবনে দেখা যেত। এছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে ছিল বিভিন্ন ধরণের পাখি, যেমন শকুন, বাজ পাখি, পেঁচা, ঘুঘু, সবুজ পায়রা, টিয়া, কাঠঠোকরা, পেলিক্যান, স্টরক, বক, কাক, মাছরাঙা, অরিয়ল এবং বিভিন্ন ধরণের বুনো হাঁস প্রভৃতি। আর নদীগুলিতে ছিল কুমির। কিন্তু হান্টারের এই বর্ণনার কুড়ি বছর পূর্বে নদীগুলিতে যে কুমিরের সংখ্যা আরও বেশি ছিল, তা হান্টার নিজেই স্বীকার করেন। কুমিরের সংখ্যা ক্রমশ কম হওয়ার কারণ হিসেবে গরম আবহাওয়ার কথাই বলেন তিনি।

তৎকালীন সুন্দরবন অঞ্চলে (২৪ পরগণা, যশোর এবং বাকেরগঞ্জের বিস্তৃত অংশ) মুসলমান, হিন্দু এবং কিছু দেশীয় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস ছিল। বাকেরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষদের কথাও জানা যায়। এই সময় সুন্দরবন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে ভাত, মাছের তরকারি, সব্জি, ডাল ছিল তাদের মূল খাদ্য। তবে নিয়মিত ভাবে দুধ পান করার কথা জানা যায়না। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষ্যে দুধের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আর স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের দুই সন্তান – এরকমই ছিল বেশিরভাগ পরিবারের গঠন।

সুন্দরবন এলাকায় শহর বলতে কিছু ছিলনা। কিন্তু মাতলা নদীর তীরে পোর্ট ক্যানিং ছিল একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি। তৎকালীন পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর পোর্ট ক্যানিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এই পোর্ট ক্যানিং-য়ে ছিল ৩৮৬ টি বাড়ি বা কুঁড়েঘর এবং মোট জনসংখ্যা ছিল ৭১৪ জন। একমাত্র ক্যানিং-য়েই ছিল একটিমাত্র পাকা রাস্তা। এছাড়া সমগ্র সুন্দরবনে মাটির রাস্তা এবং নৌকাপথই ছিল প্রধান। অবশ্য মাটির রাস্তা বললেও তা আসলে ছিল পায়ে হাঁটার পথ।

ধান চাষ-ই ছিল একমাত্র প্রধান ফসল। সুন্দরবনে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনুযায়ী একমাত্র ধান-ই ব্যাপকভাবে চাষ করা হত। সুন্দরবন এলাকায় অন্যান্য যে সব সব্জি ও ফসলের চাষ হত, সেগুলি হল – মটরশুঁটি, তিল, সর্ষে, লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন, কুমড়ো, শসা, কচু প্রভৃতি। আখ ও পান

চাষ হত একমাত্র বাকেরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবন এলাকায়। আর এই সমস্ত ফসল ও সব্জি বিক্রি করার জন্য কলকাতার বাজারগুলিতে তা চালান করা হত। ২৪ পরগণায় কাবাদক নদীর পশ্চিম তীরে লট নং ২১১ তে পাট চাষের কথাও জানা যায়। এসময় বাকেরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবন এলাকায় এবং সাগর দ্বীপে আলু চাষের উদ্যোগ সফল হলেও ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ সফল হয়নি। এসময় সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় দুই ধরণের ধান চাষের কথা জানা যায়। এই দুই ধরণের ধান হল – আউস এবং আমন। এর মধ্যে দশ রকমের আউস ধান এবং সাতাশ রকম আমন ধানের কথাও উল্লেখ করেন মি . হান্টার। এই দশ রকম আউস ধান হল – কালিয়া বোরো, লাউতানি বোরো, পিপরা সাল, কেলে আউস, গোটা আউস, সূর্যমণি, অর্জুন সাল, তুলসি ঝুরি, পায়রামণি এবং দুর্গাভোগ প্রভৃতি। আউস ধান চাষ করা হত মে-জুন মাসে এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা হত। আর আমন ধানের চাষ হত জুলাই-আগস্ট মাসে এবং ধান কাটা হত ডিসেম্বর-জানুয়ারি তথা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য যে তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনারের তথ্য অনুযায়ী ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৪ পরগণায় চাষের উপযুক্ত জমি প্রস্তুত করার জন্য ২১২,৬৫৯ একর বা ৩৩২.২৮ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল। কমিশনারের তথ্য অনুযায়ী ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জ, ২৪ পরগনা এবং যশোরে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা হয় মোট ৬৯৫,৭৩৩ একর বা ১০৮৭. ০৮ বর্গ মাইল।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান এবং পরিবেশ ভাবনার ভুবন এবং তার বহুত্ব মণ্ডিত জগত

রবীন্দ্রনাথের চিন্তন বিশ্বের দ্যোতনাময় জগতে বিজ্ঞান এবং পরিবেশ ভাবনা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে আছে, তা আর অজানা নয়; এমনকি নতুন নতুন যে গবেষণার পথ এবং পদ্ধতি তার সম্পর্কে এবং তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে তাতে তাঁর উন্নয়ন ভাবনার পরিসরে পরিবেশ এবং বিজ্ঞানের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকা ছিল এবং তা ছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে শুধু এগিয়ে থাকা নয়, বরঞ্চ অনেক পরিমাণে নতুন ধরণের স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত। যে স্বাতন্ত্র্য তাঁকে উন্নীত করেছিল এক বৈপ্লবিক চিন্তাপুরুষের স্তরে।

পুঁজি-বাজার এবং রাষ্ট্র নির্ভর অর্থনীতি ও উন্নয়ন ভাবনার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরে ছিলেন প্রকৃতি-সংলগ্ন এবং সমবায়ী জীবনবোধ ও অর্থনীতির ভাবনা, তিনি প্রয়োগ করে দেখে ছিলেন তার শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের উদ্যোগগুলির মধ্যে। মহীরুহপ্রতিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে অসম্ভব দৃঢ়তা নিয়ে তিনি তুলে ধরে ছিলেন তাঁর অসামান্য ভাবনার ক্ষেত্রগুলি, যার মধ্যে পরিবেশ এবং বিজ্ঞান ভাবনা ছিল প্রায় কেন্দ্রীয় স্তরে। আমরা আজ এই বিজ্ঞানজনিত ধ্বংস্ব আর প্রযুক্তি-আশ্রয়ী সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখনই তাঁর মনীষার সুবিশাল আশ্রয়ে সংলগ্ন হতে চাই তখন তাঁর বিজ্ঞান এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি আমাদের সামনে নতুন শুশ্রূষার জগত উন্মেচিত করে দেয়।

রাষ্ট্র নির্ভর অর্থনীতি ও উন্নয়ন ভাবনার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরে ছিলেন প্রকৃতি-সংলগ্ন এবং সমবায়ী জীবনবোধ এবং অর্থনীতির ভাবনা

আজ যে দুখানি প্রবন্ধ সংকলন নিয়ে আমাদের আলোচনা তা প্রধানত কিশোর কিশোরীদের জন্যে হলেও, সেখানে প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই আমাদের মনোবেশী রবীন্দ্র পাঠের জগতে নতুন ভাবনার চোখ উন্মীলিত করতে পারে।

দে'জ প্রকাশিত দুখানি প্রবন্ধ-সংকলন আজকের ধ্বংস্ব-উন্মুখ এবং ভাঙন-সর্বস্ব পৃথিবীতে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত যখন এই পরিবর্তন সময়ে প্রতিরোধের উপাদান ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। সংকুচিত উপাদানের সাহচর্যে আজ নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত হতে হবে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে নেওয়ার জন্য। শুধু মাত্র পাঠ্যাংশের রবীন্দ্রনাথ নয় বরঞ্চ আমাদের ভাবনায় থাকবেন সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, যিনি প্রতিদিনের কর্তব্য লিপ্ত জীবনে তুলে আনতে পারেন নতুন জাগরণের প্রতি মুহূর্তে, এমন অনেক বোধ সঞ্চরণের সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে যা নতুন প্রজন্মের সামনে নতুন বোধ সঞ্চারের পথ তৈরি করবে। আমাদের মনে হয় আজ যখন রবীন্দ্র-ভাবনার সম্প্রসারণে আমরা নতুন করে চিন্তা করে চলেছি এবং পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছেন, তখন এই দুখানি বই যদি শিক্ষাঙ্গনে পাঠ করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ করতে অনুপ্রাণিত করে তোলা হয় তবে তা এক নতুন সময় চিহ্নের জন্ম দেবে।

নতুন ধারার "বিজ্ঞান"শিক্ষা ভাবনা এবং "একলব্য" ও তার "হোসঙ্গাবাদ সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম"

এই লেখা শুধু বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে নয়, আবার বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়েও। আমরা এই লেখাতে তুলে আনার চেষ্টা করব এমন এক ধরণের বিজ্ঞান-পাঠ এর প্রণালী যা এতদিন ধরে শুধু মাত্র মধ্যপ্রদেশের সীমিত কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও আজ সারা দেশের শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ মনোযোগ এর প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাড়িয়েছে। যে কারণে আজ এই লেখাতে আমরা তুলে ধরতে চাইব "একলব্য" প্রবর্তিত "হোসঙ্গাবাদ সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম" এর মূল সুত্রগুলি, যা এখন সারা দেশ জুড়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল আধার হয়ে দাড়িয়েছে। এর পাশাপাশি এই "কর্মসূচী" অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে "গণবিজ্ঞান আন্দোলন" গুলিকেও, এমনকি এই রাজ্যেও আমরা তার প্রভাব দেখেছি অনেক বিজ্ঞান শিক্ষা কর্মসূচীর ভিতরে। ১৯৭২ সালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচীতে Friends of the Rural Centre আর Kishore Bharati নামক দু'টি সংগঠনকে সেই সময়কার মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার সহায়তা করেছিল বিদ্যালয় স্তরে এমন একটা বিজ্ঞান শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি করার জন্য যেখানে "question" করা আর নিরীক্ষার (এক্সপেরিমেন্ট) মধ্যে দিয়ে সত্য (Truth) কে "জানা"ই (to know, to acquire) হবে প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান এখানে শুধুমাত্র কোন "বিষয়" নয়- বরঞ্চ তা এমন একটা পদ্ধতি ও মার্গ যার মধ্য দিয়ে শিক্ষাথী বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান চালাতে পারবে।

আসলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতরে এমন এক ধরণের "চাপিয়ে দেয়ার" প্রবণতা কাজ করে যে শিক্ষাথী কোন আনন্দ তার ভিতরে খুঁজে পায়না। সেই সময় বা এখনও যে বিজ্ঞানের চর্চা আমরা করি, তা শুধু যান্ত্রিক ভাবে তথ্য তুলে আনা কিছু বিষয় ছেলে মেয়েদের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কিছুর দিকে বিশেষ নজর দেয় না। সেই সময় ভারতে যে text বই নির্ভর পঠনের প্রচলন ছিল তাকে প্রশ্ন করেছিল এই "হোসঙ্গাবাদ সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম"।

প্রধানত মধ্যপ্রদেশের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে Class Six থেকে class eight এর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছিল সার্বিক একটা দৃষ্টি দিয়ে। প্রথমে এই কর্মসূচী তুলে ধরা হয়েছিল ষোল টি গ্রামীণ বিদ্যালয়ে। এই উদ্যোগে পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন Indian Institute of Technology'র সাথে যুক্ত অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং এমন অনেক মানুষ, যারা সেদিন আলাদা আলাদা ভাবে হলেও একই ধরণের চিন্তা করছিলেন।

প্রথম যে বিষয়ের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল তা ছিল শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিকগুলিতে নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে উৎসাহী করে তোলা। এখানে শিখন এর উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। আর এটা করতে গিয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে বাজার চলতি বইগুলোর থেকে বেশি জোর দিতে হবে স্বাধীন পাঠের ওপরে, যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল স্তম্ভ "Activity-based learning" আর "theoratical Learning" এর মেলবন্ধন। শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল এমন এক "পাঠ-পরিবেশ" এর ভিতরে, যেখানে তার নিজের চিন্তা ডানা মেলতে পারে স্বাধীনভাবে। এই কাজে যাতে শিক্ষক বিশেষ ভাবে ভুমিকা নিতে পারেন তার জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল তাদের চেতনাগত মানের বিকাশ এর ওপরে। কিন্তু যে বিষয়ে এই আন্দোলন সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ছিল "হোসঙ্গাবাদ সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম" (Hosangabad Science Teaching Programme), এর চিন্তার বার্তা বহনকারী বিভিন্ন বই যা আজও সারা দেশে আলোচিত হয়ে চলেছে। এই বই গুলি তৈরি হয়েছিল যতোদূর পারা যায় স্থানীয় অনুষঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখে। বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের বইগুলোর ভিতরে এমন অনেক উপাদান ছিল যেগুলো এখন নতুন করে যারা National Curriculum Framework 2005 আর Right to Education এর ধারণাগত প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে সারা দেশে বই লিখছেন তাঁরা আজকের মত করে তাদের বইগুলিতে রাখছেন। Social Science এর বইগুলো নির্মাণ করার সময় তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এমন একটা প্রজন্ম যারা সমালোচনামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেশ আর সমাজের সমস্যাগুলো দেখতে জানতে আর বুঝতে শিখবে। তবে অনেক সময় প্রশ্ন উঠেছে এই ভাবে "activity-based and experiential Learning" এর ভিতর দিয়ে কতদূর "Exact Knowledge" তুলে ধরা যেতে পারে ... এ নিয়ে খুব ভাল আলোচনা করেছেন প্রফেসর অনিল সাদগোপাল। তিনি "Exact Knowledge" এর "definition" নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আর জানিয়েছেন "we have to resist the packaged knowledge"

2003 সাল নাগাদ এই "হোসঙ্গাবাদ সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম" (Hosangabad Science Teaching Programme) বন্ধ হয়ে যায় বা করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম ততদিনে এমন অনেক কিছুর জন্ম দিয়ে ফেলেছে যা আজ-ও তার প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকার কারণ।

বিদ্যালয় শিক্ষার্থী মননে জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সংক্রান্ত চেতনার উন্মেষে শিক্ষকের নতুন ভূমিকার সন্ধানে একটি প্রস্তাবনা

১) খুব ধৈর্য্যের সাথে প্রধানত স্থানীয় সূত্র এবং উদাহরণ-সহযোগে তুলে ধরতে হবে। জৈববৈচিত্র্য ধারণার প্রধান চুম্বকগুলো কী এবং বিশেষভাবে স্থানীয় স্তরে কেন এই বৈচিত্র্য বিপদের সম্মুখীন। এর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে এই জৈববৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়ে যাবার জন্য মানুষ কেন তার দায় এড়াতে পারে না।

২) জৈববৈচিত্র্যের প্রধান উপাদানগুলো কি কি? এবং সেগুলো কেন জরুরী ও স্থানীয় স্তরে সেগুলো এতদিন কোন ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, এখানে প্রয়োজন রয়েছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাবার। যেখানে তাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

৩) এখানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইতিমধ্যেই যে জৈববৈচিত্র্য রয়েছে তার সাথে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন এবং এটা করার জন্য শিক্ষককে আগে খুব ভালো ভাবে নিজেকে বুঝে নিতে হবে এবং ঠিক করে নিতে হবে তা তিনি তুলে ধরবেন কিভাবে?

৪) বাংলার গ্রামীণ পরিসরে কৃষি-জৈববৈচিত্র্য খুব জরুরী এবং তা ছাত্রছাত্রীদের সামনে খুব গভীর ভাবে তুলে ধরতে হবে। এখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এলাকার বয়স্ক কৃষক, যিনি এবিষয়ে খুব ভালো ভাবে জানেন, তার সাথে শিক্ষককে বসতে হবে এবং খুব ভালো ভাবে তার কাছ থেকে বিগত দিনের কী কৃষি-বৈচিত্র্য ছিলো তা জেনে নিতে হবে। এ বিষয়টি নিয়ে আজ আমাদের দেশে প্রভূত চর্চা শুরু হয়েছে এবং অনেক পেশাদার উন্নয়ন সংস্থা, যারা সুস্থায়ী কৃষি নিয়ে কাজ করেন এবং সারা দেশ জুড়ে জালিকা ভিত্তিক স্বপক্ষতা প্রচার চালান, তাদের সাথে আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষকদের যোগাযোগ স্থাপন করে নিতে হবে। তাদের যেসমস্ত মূদ্রিত প্রচার পুস্তক-পুস্তিকা রয়েছে তা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং তাদের সেগুলি সুনিবিড় ভাবে পাঠ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

৫) ছাত্রছাত্রীদের কিছু সমীক্ষা ভিত্তিক কৃত্যালি করাতে হবে। যেমন ধরা যাক একটি বিশেষ শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে তাদের নিজেদের পরিবার এবং অন্য দুখানি পরিবারের থেকে লিখে আনবে দেশীয় ধান্যবীজ এখন কি কি আছে এবং ব্যবহার হয় ও আগে কি কি ছিলো সবার কাজ হয়ে গেলে সেগুলো একত্রীভূত করে তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে।

৬) এর পাশাপাশি স্থানীয় অরণ্য সম্পদের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষককে এই ধরণের জ্ঞান গঠনের জন্য খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এই প্রস্তুতির পর্বে স্থানীয় অরণ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে খুব ভালো ভাবে যোগাযোগ করে সমস্ত তথ্য তুলে আনতে হবে। এইসব সংগৃহী তথ্য তাকে তুলে ধরতে হবে শিক্ষার্থীদের সামনে। এর সমান্তরালে যদি সম্ভব হয় তাকে ছাত্রদের নিয়ে যেতে হবে অরণ্যে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যেতে হবে অরণ্যে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা জানবে তাদের অরণ্যের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো।

৭) নতুন করে জৈববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে যদি শিক্ষককে উদ্যোগী হতে হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা ভালো পরিকল্পনা কর খুব জরুরী। এখানে পরিকল্পনা করার সময় ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয়তা যাতে পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে তা ভালো ভাবে খেয়াল রাখা খুব দরকার। এখানে নার্সারীতে চারা উৎপাদনের মতো বিশেষ একটা দক্ষতা আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করতে পারি।

৮) এখানে শিক্ষার্থীদের পরিবারগুলোতে নতুন চেতনার সংবহন করানো খুব প্রয়োজন। তাদের নিয়ে বারে বারে বসতে হবে এবং নতুন চেতনার জাগরণ-ঘটাতে হবে।

৯) গ্রামস্তরে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সাথে আরো সুদৃঢ় যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই যোগাযোগগুলি যাতে বিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হয় তার জন্য সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকের ভূমিকা আরো সুনিপুন করে তুলতে।

১০) এই পুরো উদ্যোগের মধ্যে পঞ্চায়েতের ভূমিকা যেন খুব সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় তা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো পুরো বিষয়টা নিয়ে খুব ভালো আলোচনা।

সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়
মনুষ্যত্বের জাগরণ, আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং সত্যানুসরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঠের শেষে নতুন দিগন্ত

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে সকাল থেকেই পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির বুড়দা কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলিতে ঘরে ঘরে ছিল তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মাঠে যাবার তাড়া। কারণ সেদিন ছিল বুড়দা কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত সারাদিনব্যাপী ফুটবলের আসর। এখানে যোগ দিয়েছিল সমস্ত সংসদের ফুটবল টিম। ঠিক একমাস আগে যখন ঘোষণা হয়েছিল এই উৎসবের তখন থেকেই আনন্দের আগমনী ছিল আকাশে বাতাসে। একে বসন্ত কাল আকাশে সোনা রোদ... আর তার মাঝে অঞ্চলের ছেলেদের খেলা।

সকাল সাড়ে ৯ টায় খেলা শুরু হতেই বুড়ো রামনাথ বলেন, ভাবিনি কোনোদিন আমাদের 'মা' বুড়দা কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এরকম খেলা আয়োজন করা যেতে পারে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে উত্তেজনা...সারা মাঠ জুড়ে অঞ্চলের ছেলেরা কে কেমন খেলছে তা দেখার জন্য ভিড় উপচে ওঠে।

সকলের মুখে একটাই কথা... আমাদের বুড়দা কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এত উদার মন! কেন আগে কাছে আসিনি, শুধু ভুল বুঝেছি...

এদিকে খেলা হতে হতে সেমি-ফাইনাল শেষ করে যখন ফাইনাল-পর্ব এগিয়ে আসে, মাঠে তখন সত্যিই বসন্ত।

রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল এগিয়ে চলেছে, যাঁরা দেখছেন তাঁদের মুখে তখন স্থানীয় গান নাচ...খেলা গড়িয়ে চলে আর সময়ের ভিতরে মীমাংসা না হবার কারণে আসে পেনাল্টি। সারা মাঠ তখন নেমে এসেছে 'মাঠে'।

গো ওওওওওল... জিতল বুকাডি সংসদ। পুরস্কার দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন প্রধান সাহেব... কেন আগে এভাবে আয়োজন করিনি। বিকেলের রোদ তখন মরে এসেছে আর তার মাঝে শুধু উল্লাস আর স্থানীয় গানে বাড়ি ফেরার তাড়া।

আসছে বছর আবার হবে... হতেই হবে।

সর্পমঙ্গলঃ সাপ নিয়ে একটি অনবদ্য তথ্যচিত্র

সরীসৃপ প্রাণীগুলির মধ্যে সাপ আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত প্রাণী। কিন্তু পরিচিত হওয়ার পরেও সাপের নাম উঠলেই আমরা অনেকেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। আতঙ্কিত হই। বিশেষ করে রাত্রিতে আমরা অনেকেই কুসংস্কারবশত এখনও সাপের নাম উচ্চারণ করিনা। শুধু নাম উচ্চারণ করার ক্ষেত্রেই নয়, সাপ সম্পর্কেও রয়েছে আমাদের বিভিন্ন রকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। প্রকৃতপক্ষে সাপ সম্পর্কে যে পরিচিতি আমাদের কাছে রয়েছে, তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। স্বাভাবিক ভাবেই সাপ সম্পর্কে নানা গুজব এবং তা থেকে যে সব প্রচলিত কাহিনীর জন্ম হয়, তা মানুষকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে তোলে। আমরা জানি পুরাণ কাহিনীর মধ্য দিয়েই কালনাগিনী সাপের ভ্রান্ত পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের জনমানসে। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস প্রযোজিত "সর্পমঙ্গল" তথ্যচিত্রে সেই সব ভ্রান্ত পরিচিতি ও কুসংস্কারগুলিকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে এবং শুধু কালনাগিনী নয়, সমস্ত প্রজাতির সাপ সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, কোন কোন সাপের বিষ রয়েছে, কোন কোন সাপের বিষ নেই, বা কোন সাপগুলি ক্ষীণ বিষযুক্ত, কোন সাপ কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সাপে কামড়ালে আমাদের কি করণীয়, তাও খুব সুন্দরভাবে সহজ সরল ভাষায় এই তথ্যচিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কোন সাপ কি রকম দেখতে তা বোঝানোর জন্য প্রতিটি প্রজাতির সাপের উপযুক্ত ছবিও এই তথ্যচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। এই তথ্যচিত্রটি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসহ শিক্ষকদের মধ্যেও বেশ সাড়া জাগিয়েছে। আমরা এই "সর্পমঙ্গল" তথ্যচিত্রটির আরও বহুল প্রদর্শন কামনা করি। সর্বোপরি আমাদের সমাজে দুধ কলা দিয়ে বাড়িতে সাপ পুষে রাখার যে প্রবাদ চালু রয়েছে তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা ছাড়াও সকলের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মত একটি উপযুক্ত তথ্যচিত্রঃ সর্পমঙ্গল। এই তথ্যচিত্রটি সংগ্রহ করতে হলে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়ঃ অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস, ৫ /১/২ জি কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০১৯

বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে

সারাদিনব্যাপী আলোচনা ও ভাবনা বিনিময়

সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলায় বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এবং অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য বাধডি রুরাল হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটির সহযোগিতায় বাঘমুণ্ডি হাইস্কুলে আয়োজিত হল সারাদিনব্যাপি একটি আলোচনাসভা। আলোচনা সভার বিষয় ছিলঃ "জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা এবং পশ্চিমবঙ্গের নবপ্রবর্তিত বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর প্রাসঙ্গিকতা।

"স্থানীয় বিধায়ক শ্রী নেপালচন্দ্র মাহাতো মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৩রা অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী অবনীভূষণ সিংহ, আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্ভুক্ত কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রেম লামা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী নবীনানন্দ সেন, বিশিষ্ট শিক্ষক ও ,সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রী দেবাশিস মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক শ্রী মেচবাহার সেখ, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের চেয়ারম্যান শ্রী আবীর চক্রবর্তী, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রত্নদীপ দে এবং স্থানীয় বাঘমুণ্ডি ব্লকের দুই বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী নিবারণ চন্দ্র মাহাতো ও শ্রী চিত্তরঞ্জন মাহাতো প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য যে স্থানীয় বাঘমুণ্ডি ব্লকের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, এম এস কে এবং এস এস কে প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রায় দ্বিশতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, সহায়ক ও সহায়িকাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমগ্র আলোচনাসভাটি আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বাঘমুণ্ডি হাইস্কুলের ছাত্রীদের কণ্ঠে একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আলোচনাসভাটির শুভ উদ্বোধন ঘটে। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রী নেপালচন্দ্র মাহাতো। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, সহায়ক ও সহায়িকাদের স্বাগত জানিয়ে এদিন শ্রী নেপালচন্দ্র মাহাতো বলেন যে জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫ অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলার ক্ষেত্রে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় এবং এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সদস্য ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দ তথা বিদ্বজনদের চিন্তাভাবনা কিরকম– তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতামত আদানপ্রদান করাই হল এই সভার মূল উদ্দেশ্য। শ্রী মাহাতো বিস্তারিত ভাবে আরও বলেনঃ "গতানুগতিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা মুখস্তবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের মধ্যে কোনও নতুন জ্ঞান ও দক্ষতার সৃষ্টি হয়না।

তাই পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। তবেই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার সৃষ্টি হবে এবং সেই জ্ঞান ও দক্ষতা তারা তাদের নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। এটা যেন আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারি।

"বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী অবনীভূষণ সিংহও এদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে স্থানীয় পারিপার্শ্বিক জগতের সম্পর্ক ও সমন্বয় ঘটানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শিক্ষার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের সম্পর্ক ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিয়ে এদিন কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫এর প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষা নিয়ে নিজের চিন্তাভাবনাসহ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগগুলি নিয়ে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি করেন সেখানকার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রেম লামা।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক শ্রী মেচবাহার সেখ শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রম

রূপরেখা ২০০৫ এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার গুরুত্ব স্বীকার করে বেশ কিছু বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপলব্ধি ঘটানোর চেষ্টা করেন। সেক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে তিনি প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন, সেগুলি হল- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কমিটমেনট, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাৎসরিক কর্মদিবসের হিসাব এবং বিদ্যালয়ে তাঁদের শ্রমদান, শিক্ষাদানের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা ও মূল্যবোধ প্রভৃতি।

শ্রী মেচবাহার সেখ বলেন যে তিনি এই প্রশ্নগুলি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কোনও শিক্ষককে অভিযুক্ত করতে চাইছেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে একটা thinking process-এর মধ্যে ঢুকতে চাইছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে তাঁদের নিজেদেরও মুল্যায়নের প্রয়োজন আছে বলেও তিনি স্বীকার করেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থানীয় কম্যুনিটির যোগাযোগ গড়ে তোলা, বিদ্যালয়ের সঙ্গে পঞ্চায়েতের সংযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিও শ্রী মেচবাহার সেখ এদিন বিশেষ গুরুত্ব দেন।

বিশিষ্ট শিক্ষক এবং সিলেবাস কমিটির প্রাক্তন সদস্য শ্রী দেবাশিস মণ্ডল এদিন activity based learningএর কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বলেন যে শিক্ষাকে joyful learningএর জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু শিক্ষক নিজেই joyful অবস্থায় নেই, তিনি অন্যকে joyful করবেন কিভাবে। প্রাসঙ্গিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী দেবাশিস মণ্ডল আক্ষেপের স্বরে উচ্চারণ করেনঃ " জ্ঞান অর্জন করেছি কিন্তু তার প্রয়োগের জায়গাটায় খামতি থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমিও এই শিক্ষা পদ্ধতিতে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছি। আসলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ। background পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা এক জায়গায় স্থির হয়ে গেছি। অর্থাৎ আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। আমরা মুখস্ত বিদ্যায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে আমরা শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে শিখিনি।" শ্রী দেবাশিস মণ্ডল আরও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেন যে শিক্ষার যদি প্রয়োগ না ঘটে, যদি তা কাজে না লাগে, তাহলে সেই শিক্ষা পড়ুয়াদের কাছে ভারবাহী হয়ে যাবে।

পরিশেষে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী রত্নদীপ দে উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী এবং সহায়ক সহায়িকাদের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জানান। শ্রী রত্নদীপ দে এদিন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেনঃ " শিক্ষার প্রয়োগ নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষকদেরও চেষ্টা রয়েছে তা বুঝতে পারছি।

আমরা জানি যে শিক্ষার বিষয়গুলি যত বেশি localized হয়, তখনই তা তত বেশি শেখা যায়। তবে বর্তমান পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষকদের অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া আছে যে তাঁরা কিভাবে শেখাবেন। কিন্তু এটাও খুব সহজ কাজ নয় তা জানি, তবে শিক্ষকরাও যে এগিয়ে এসেছেন তাও বুঝতে পারছি।

"শ্রী রত্নদীপ দে এদিন এই আলোচনাসভা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার জন্য বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই আলোচনাসভায় বাঘমুণ্ডি ব্লকের বি ডি ও শ্রী অভিষেক বিশ্বাস অনিবার্য কারণবশত উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার ফলেই এই সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে এদিন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভসের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য বাধডি রুরাল হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটির পক্ষে স্বীকার করা হয়েছে।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও শান্তি মূদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

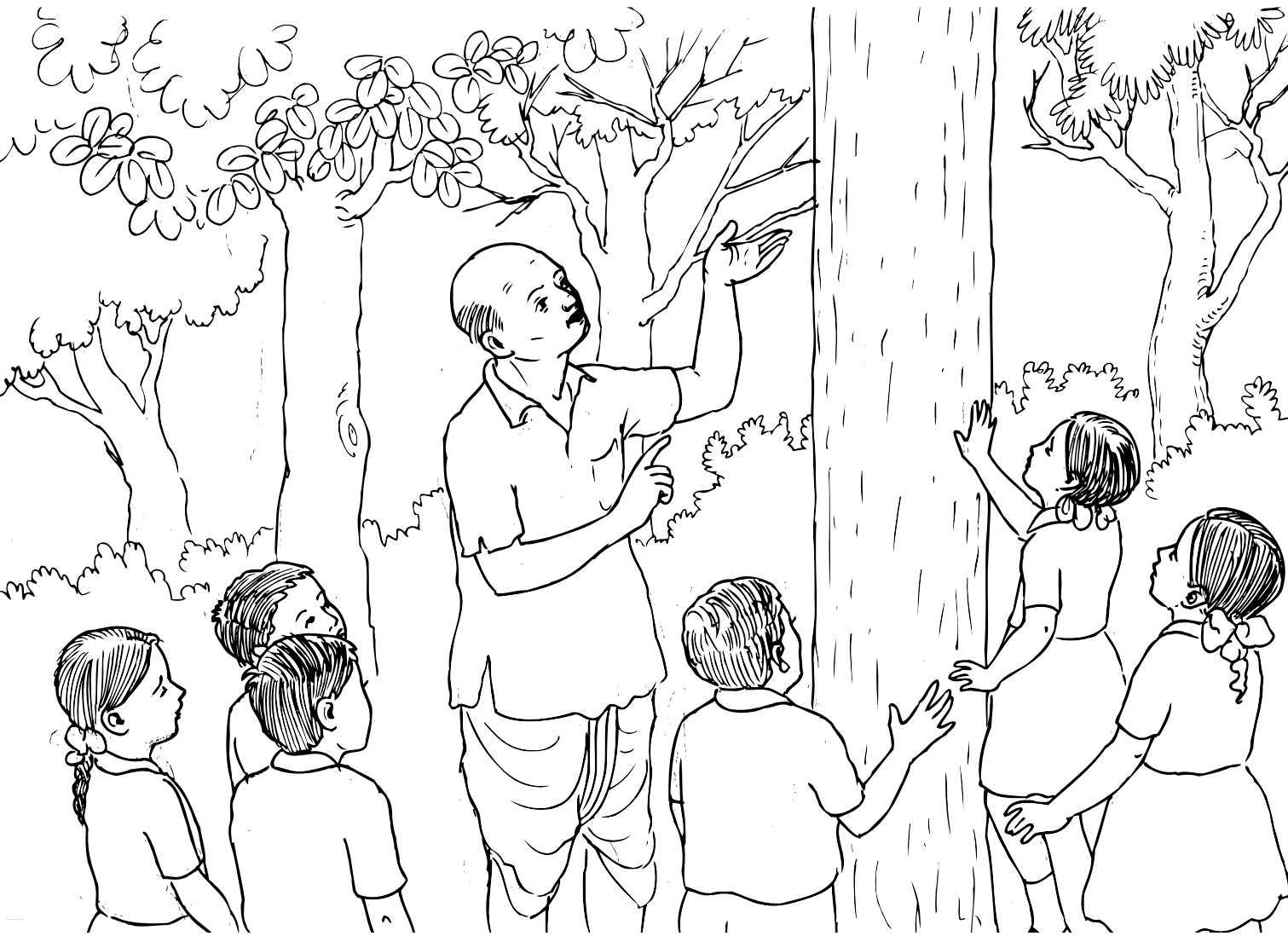

সংকলন ১০। ■ এপ্রিল ২০১৬

[redacted]